দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

শিক্ষাবিদ হিসেবে
ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির
প্রকৃত মূল্যায়ন হয়নি
— পৃঃ ১১

নোয়াখালি ও কুমিল্লায় গণহত্যা
প্রতিরোধ এবং মানবত্রাণে
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা
— পৃঃ ১৫

৭৫ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা।। ৩ জুলাই, ২০২৩।। ১৭ আষাঢ় - ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যা।। website : www.eswastika.com

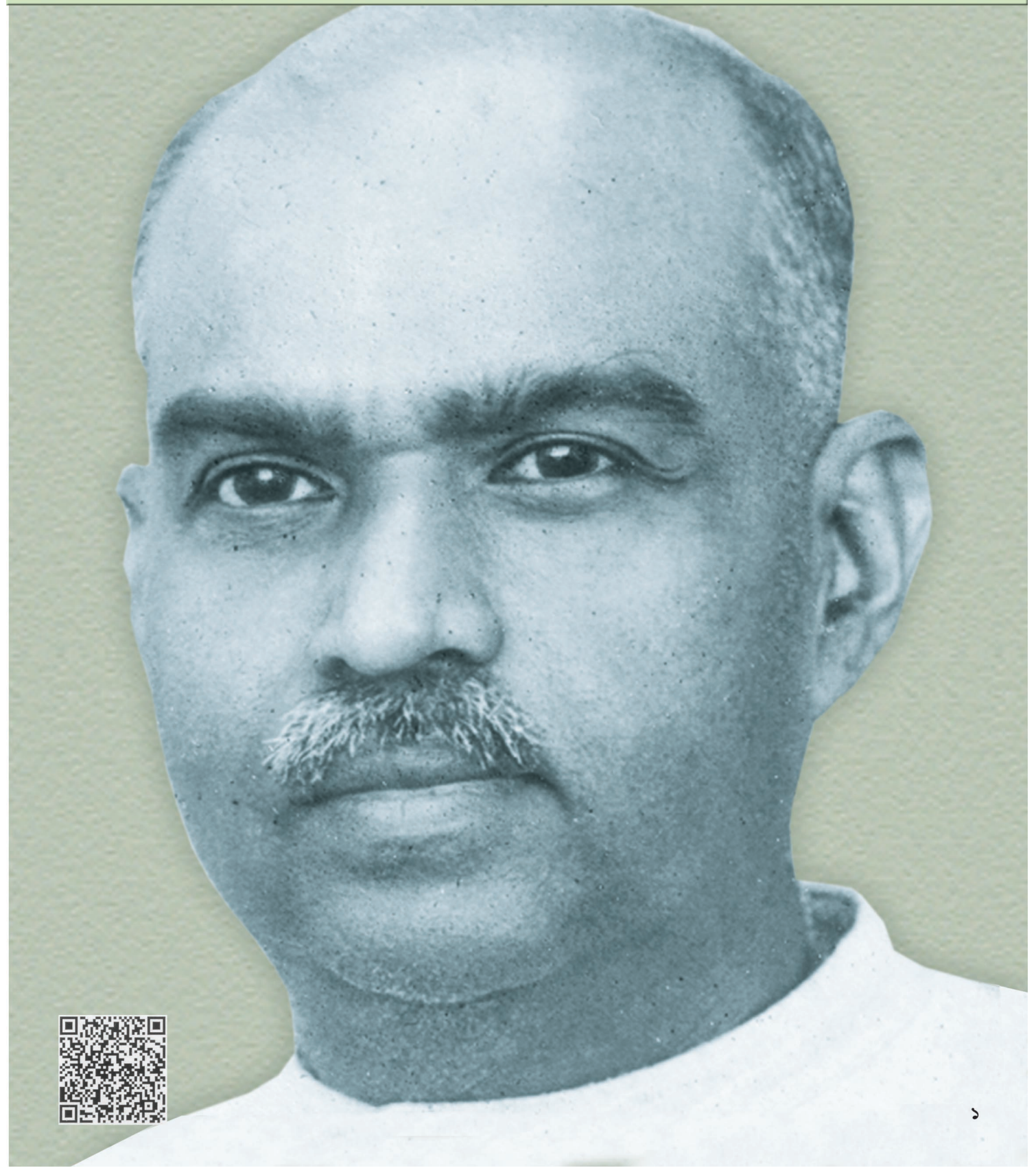

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যা

৭৫ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা, ১৭ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

৩ জুলাই - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

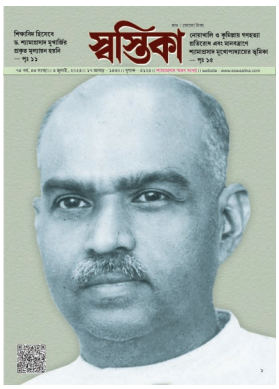

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

তৃণমূলে রুশ ছায়া, মমতার 'কাঁচকলা' বনাম দুর্নীতির 'আদা'

☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

দিদিরে ক্ষমো হে ক্ষমো...☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

আধুনিক ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভাবনা ☐ ড. জিষ্ণু বসু ☐ ৮

শিক্ষাবিদ হিসেবে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রকৃত মূল্যায়ন হয়নি

☐ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ☐ ১১

নোয়াখালি ও কুমিল্লায় গণহত্যা প্রতিরোধ এবং মানবত্রাণে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা

☐ বিমল শঙ্কর নন্দ ☐ ১৫

বঙ্গীয় ঘরানার এক দূরদর্শী ভারতীয় রাষ্ট্রনেতা ড. শ্যামাপ্রসাদ

☐ বিনয় ভূষণ দাশ ☐ ১৯

শুধু কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে এরাজ্যে সুষ্ঠু নির্বাচন অসম্ভব

☐ সাধন কুমার পাল ☐ ২৩

পশ্চিমবঙ্গে হিংসার রাজনীতি বন্ধ না হলে রাজ্যের ভবিষ্যৎ অন্ধকার ☐ আনন্দ মোহন দাস ☐ ২৫

পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গ্রামসভা আবার ফিরে আসুক

☐ হরিমোহন দাস ☐ ৩১

শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটাতে চেয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ ☐ ড. তরুণ মজুমদার ☐ ৩৫

স্বাধীন ভারতের প্রথম শিল্পমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ

☐ অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ ৪৩

বামফ্রন্ট আমলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটে

☐ অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় ☐ ৪৭

রাজনৈতিক দলকেন্দ্রিক পঞ্চায়েতরাজ শুধু পশ্চিমবঙ্গেই

☐ নারায়ণশঙ্কর দাশ ☐ ৪৮

নিয়মিত বিভাগ :

সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ ☐ অন্যরকম : ৩৯

প্রকাশিত হবে ১০ জুলাই, ২০২৩

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে ১০ জুলাই, ২০২৩

ছেচল্লিশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের ভরাডুবি

কেমন ছিল স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের প্রথম তিন দশকের শিল্প ও অর্থনৈতিক পরিবেশ? বামফ্রন্টের চৌত্রিশ এবং তৃণমূলের বারো বছরের শাসনেই-বা কেমন হয়েছে? স্বাধীনতার পর নৃশংস হিন্দু নিধন ও উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান করে সদ্য গঠিত রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী ডা: বিধান চন্দ্র রায় রাজ্যের অর্থনীতি ও শিল্প সম্ভাবনার ভিত স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু বাম আমলে দেখা গেল হুগলী জেলার এক চটকল মালিককে খুন করল জঙ্গি সিটু ইউনিয়নের কর্মীরা। ধীরে ধীরে বন্ধ হলো সমস্ত চটকল এবং আরও অজস্র পৃথিবী বিখ্যাত সংস্থা। কিন্তু নতুন শিল্প গড়ে উঠল না। তৃণমূল আমলেও একই অবস্থা।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়গুলি অনুসন্ধান করা হবে। লিখবেন এই সময়ের বিশিষ্ট লেখকরা

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্রনেতা শ্যামাপ্রসাদ

বলা হইয়া থাকে, একজন রাজনৈতিক নেতা শুধুমাত্র আগামী নির্বাচনের কথা ভাবিয়া থাকেন, আর রাষ্ট্রনেতা ভাবিয়া থাকেন আগামী প্রজন্মের কথা। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আগামী প্রজন্মের কথা ভাবিয়াই রাজনীতিতে আসিয়াছিলেন। সেই অর্থে তাঁহাকে আধুনিক ইতিহাসে একজন প্রকৃত রাষ্ট্রনেতার অভিধায় ভূষিত করা যাইতে পারে। তিনি দূরদর্শী নেতা ছিলেন। সেই সময় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতির রূপটি একমাত্র তিনিই অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন। প্রথমদিকে তিনি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। ছিলেন শিক্ষাব্রতী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে তাঁহার শিক্ষা সংস্কারের কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। কিন্তু মুসলিম লিগের উত্থান এবং কংগ্রেসের দুর্বল নীতি তাঁহাকে রাজনীতিতে পদার্পণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। বিভেদকামী মুসলিম লিগকে তিনি ক্ষমতার বৃত্ত হইতে দূরে রাখিবার জন্য ফজলুল হকের মন্ত্রীসভায় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই মন্ত্রীসভার অর্থমন্ত্রী হিসাবে তিনি যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ব্রিটিশ শাসনে লিগের গুন্ডাবাহিনীর নৃশংস অত্যাচারের দিনগুলিতে তাঁহার যোগ্য নেতৃত্ব দেশবাসী চিরকাল মনে রাখিবে। সেই সময় তিনি মানবতার পূজারি নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। মেদিনীপুরের ভয়াবহ বন্যা, সমগ্র বঙ্গপ্রদেশে দুর্ভিক্ষের হাহাকার, মুসলিম লিগের জিহাদিদের দ্বারা কলকাতা ও নোয়াখালিতে হিন্দুদের উপর নৃশংস আক্রমণ ও নরসংহার এবং দেশভাগজনিত হিন্দু উদ্বাস্তুদের সহায়তা— সর্বত্রই তিনি ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। দেশ বিভাগের প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন তিনি। মুসলিম লিগের গুন্ডাগিরির সম্মুখে নতি স্বীকার করিয়া কংগ্রেস দেশবিভাগে সম্মতি জানাইলে তিনি বাঙ্গালি হিন্দুর বিপদ অনুধাবন করিয়া বঙ্গবিভাগের দাবি করিয়াছেন। প্রবল আন্দোলন সংগঠিত করিয়া পাকিস্তানের কবল হইতে পশ্চিমবঙ্গ ছিনাইয়া লইয়াছেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, কংগ্রেস ভারত ভাগ করিয়াছে, তিনি পাকিস্তান ভাগ করিয়াছেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় তিনি অকংগ্রেসি মন্ত্রীরূপে যোগদান করিয়া শিল্প ও সরবরাহ দপ্তরের দায়িত্ব যথেষ্ট যোগ্যতার সহিত পালন করিয়াছেন। মানুষের সমস্যা লইয়া তিনি বারবার সংসদে সরব হইয়াছেন। নেহরু-লিয়াকত চুক্তি কার্যকর না হইবার কারণে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন এবং নূতন রাজনৈতিক দল স্থাপন করিয়াছেন। যাহা বর্তমানে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং যাহার নেতৃত্বে দেশের প্রধানমন্ত্রী রূপে রহিয়াছেন বিশ্বের প্রথম ক্রমাঙ্কের অপ্রতীম নেতা নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী।

তোষণনীতিতে সিদ্ধহস্ত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সংবিধানে ৩৭০ ধারা বলবৎ করিয়া কাশ্মীরকে অবশিষ্ট ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন। ইহার কারণেই কাশ্মীর সন্ত্রাসবাদের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। শ্যামাপ্রসাদ ৩৭০ ধারার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি জোর দিয়া বলিতেন, দেশের অভ্যন্তরে আর একটি দেশ থাকিতে পারে না। কিন্তু ক্ষমতালোভী অদূরদর্শী নেতাগণ তাঁহার কথা অনুধাবন করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত জনসঙ্ঘের সংকল্প ছিল, কাশ্মীর হইতে ৩৭০ ধারার বিলোপ করিয়া, বিচ্ছিন্নতাবাদের মূলোৎপাটন করিয়া ভারতের সংহতি সাধন করা। ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য, শ্যামাপ্রসাদ সেই লক্ষ্যে সত্যাগ্রহ করিয়া কাশ্মীরে প্রবেশ করিলে তাঁহার রহস্যমৃত্যু ঘটিয়াছে। দীর্ঘ ছয়দশক অতিক্রান্ত হইবার পর তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত দলের নেতৃত্বাধীন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সেই সংকল্প পূর্ণ করিয়াছে। ৩৭০ ধারার বিলোপ ঘটিয়া কাশ্মীর অবশিষ্ট ভারতের সহিত একীভূত হইয়াছে।

শ্যামাপ্রসাদ হিন্দুস্বার্থ রক্ষায় বরাবর সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিলেও তাঁহার মধ্যে কোনোপ্রকার গোঁড়ামি কখনোও কেহ দেখিতে পান নাই। রাজনীতিতে ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও তিনি সকলের বন্ধু ছিলেন। কোনোরকম সংকীর্ণতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ক্ষমতার প্রতি লেশমাত্র লোভ তাহার ছিল না। অত্যাচারিত মানুষের অশ্রু দেখিয়া তিনি হেলায় মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের হইল, যে বাঙ্গালি হিন্দুর জন্য তিনি এতকিছু করিয়াছেন, যে বাঙ্গালি হিন্দুর মাথা গুঁজিবার স্থান করিয়া দিয়াছেন, সেই বাঙ্গালি হিন্দুর মানস হইতে কংগ্রেস-কমিউনিস্টরা দীর্ঘকাল শ্যামাপ্রসাদকে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। সুখের বিষয় যে বাঙ্গালি মানস হইতে সেই অন্ধকার অপসৃত হইতে শুরু করিয়াছে। শ্যামাপ্রসাদ পুনরায় বাঙ্গালি মননে-চিন্তনে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছেন, বাঙ্গালি তাহার পূর্বপাপ স্খালনে ব্রতী হইয়াছে। কিন্তু একটি প্রশ্ন থাকিয়াই যাইতেছে, তাহা হইল, কংগ্রেসের দুর্বল নীতির বিরোধিতার কারণেরই কি শ্যামাপ্রসাদকে কাশ্মীরে প্রাণ দিতে হইয়াছে? বাঙ্গালি হিন্দুর আশা, এই রহস্যেরও উদ্‌ঘাটন একদিন হইবে।

সুভাষিতম্

জনিতা চোপনেতা চ যস্তু বিদ্যাং প্রযচ্ছতি।

অন্নদাতা ভয়ত্রাতা পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ।। (চাণক্যনীতি)

জন্মদাতা, যজ্ঞোপবীত দাতা, বিদ্যাদাতা, অন্নদাতা এবং ভয় ত্রাতা— এই পাঁচজনকে পিতা নামে অভিহিত করা হয়।

তৃণমূলে রুশ ছায়া

মমতার ‘কাঁচকলা’ বনাম দুর্নীতির ‘আদা’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

কথায় বলে আদায় কাঁচকলায়। পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন। মনমতো না হলে সবকিছুকেই কাঁচকলা দেখান মুখ্যমন্ত্রী মমতা আর সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তদন্তকারী সংস্থা ইডি আর সিবিআই-কে বহুবার কাঁচকলা দেখিয়েছেন অভিষেকবাবু। শুধু মুখোমুখি হতে বললেই বাহানা করেন। কিছুদিন আগেই কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কাঁচকলা দেখিয়েছেন মমতা। আয়ুর্বেদ মতে আদা রেচন করে আর কাঁচকলা ধারণ। তাই বেশি আদা কাঁচকলার তরকারিতে পড়লে কাঁচকলা সেদ্ধ হয় না। একটি অন্যের বিপরীতে কাজ করে। মমতার সেই দশা। রাজ্যের মানুষের একটা বড়ো অংশ মমতার কাজকর্মকে অধিক ‘বিষ’ মনে করছে।

এই দ্বন্দ্বময় সম্পর্ক প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নামজাদা এক সাংবাদিক লিখেছিলেন— ‘চুপচাপ ফুলে ছাপ’। তার তেরো বছর পর মমতা ক্ষমতায় আসেন। আর তার তেরো বছর পর মমতার রাজনৈতিক ক্ষমতা চলে যাওয়া নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। কারণ বহিঃশত্রু নয়, কেবল অন্তর্ঘাত। পঞ্চায়েত ভোটে ৯০ শতাংশ আসনে ভোট হচ্ছে। বাকি ১০ শতাংশে তৃণমূলের পাল্লা ভারী। তৃণমূলের এক নেতার কথায় মনোনয়নের সঙ্গে মানুষের ভোটের কোনো সম্পর্ক নেই। খুব ভালো ফল করলেও তৃণমূল ৫০ শতাংশের বেশি আসন জিতবে না। মমতা অনেক কিছুকেই কাঁচকলা দেখান। কিন্তু আদা (পড়ুন দুর্নীতি) বেশি হয়ে গেলে তাঁর তরকারিতে কাঁচকলা সিদ্ধ হবে না সেটা বুঝতে চান না। যারা মনোনয়নে বিরোধীদের আটকাচ্ছে তারা যে উলটো ভোট মারবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? প্রতিদ্বন্দ্বী আসনে বিরোধীদের সাফল্য ৪০-৫০ শতাংশ হলে অবাক হব না। তবে তৃণমূলের ভোট গতবারের তুলনায় অনেকটাই কমবে।

পঞ্চায়েতে সাফল্য নিয়ে আশাবাদী নয় তৃণমূল ভোটকুশলী আই-প্যাক। দুর্নীতির দায়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাস্তি হলে এ রাজ্যে সব চাইতে খুশি হবেন তৃণমূলের কিছু বৃদ্ধ নেতা। অভিষেক তাদের হোলিকা দহন করেছে। মন্ত্রী মলয় ঘটক আটকে পড়লে পরিষ্কার হবে কেন অভিষেকবাবু সব তদন্তকারী সংস্থার নজরে। পঞ্চায়েত ভোটকে গায়ের জোরে কবজা করতে গিয়ে মমতার বিরুদ্ধে সব ধরনের নিয়ম-নীতি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। কাকে বাঁচাতে এত মরিয়া মমতা? দল না অভিষেক? সবাই জানেন মমতার গোদের ওপর বিষফোঁড়া অভিষেক। তাই খুঁজে পেতে অভিষেক বাঁচাও কর্মসূচি পালনের জন্য লেজুড় আমলা রাজীব সিনহাকে আনা হয়েছে। তাই রাজ্যপাল তাঁর নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ করার আগেই তিনি তিনি কমিশনারের কাজ শুরু করে দেন যদিও আজ পর্যন্ত তিনি কমিশনার নন। দায়িত্ব নেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নির্বাচন ঘোষণা করেন রাজীব। সেই সুযোগে ইডি-র নোটিশ এড়িয়ে যান অভিষেক। অনেকের দাবি অভিষেকের ছোবল নেই, শুধু কুলোপনার চক্কর। পঞ্চায়েত ভোট তার প্রমাণ দেবে।

> **মমতা জানেন অভিষেকের নবজোয়ার যাত্রা বন্ধ্যা। তালি-তাপ্পি দিয়ে ঢাকতে হবে। আটকাতে হবে দলে বিদ্রোহ আর অন্তর্ঘাত।**

রুশ নেতা ভ্লাদিমির পুতিন দাবি করেছেন ইউক্রেন যুদ্ধে তাঁকে পিছন থেকে ছুরি মেরেছে তাঁর ভাড়াটে সৈন্য – ওয়াগনার বিদ্রোহীরা। পুতিন তা সামলাতে পারবেন কিনা এখনই বলা মুশকিল। তবে মমতার দলে যে বিদ্রোহের ছায়া লম্বা হচ্ছে, আগামীদিনে তা সামলাতে মমতাকে হিমশিম খেতে হবে। অভিষেকের নবজোয়ার যাত্রার সাপ্লিমেন্টারি হিসাবে মমতা তাই পঞ্চায়েত ভোটে প্রচারে নামছেন।

অভিষেককে প্রত্যাঘাত করতেই ভোটের মুখে রাজ্য সভাপতি পদ ছাড়তে চান সুব্রত বক্সী। খানিকটা বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন ফিরহাদ হাকিম (ববি)। সবাই জানেন মমতার পাখির চোখ মুসলমান ভোট। প্রকাশ্যে না মানলেও ভাঙড়ের মনোনয়নে সন্ত্রাস মমতাকে অনেকটাই বিচলিত করে দিয়েছে। তাই সেখানে অভিষেক ঘনিষ্ঠদের ছেঁটে ফেলা হয়েছে। মমতা জানেন অভিষেকের নবজোয়ার যাত্রা বন্ধ্যা। তালি-তাপ্পি দিয়ে ঢাকতে হবে। আটকাতে হবে দলে বিদ্রোহ আর অন্তর্ঘাত। অনেক শুভানুধ্যায়ী মমতাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন নিঃশব্দে। ফুটো ব্যাগে কেউ পয়সা রাখে না। তারা ধরে নিয়েছেন মমতা এখন ডুবন্ত নৌকা। তাই গলাবাজি করে কাঁচকলা দেখালেও দুর্নীতির আদায় মমতার তরকারি পুড়ে যেতে বাধ্য। □

দিদিরে ক্ষমো হে ক্ষমো...

ভোটপ্রার্থীযু দিদি,

পরিস্থিতি ভালো নয় গো। ২০১৩, ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত ভোটের সময় আমি আপনাকে দেখেছি। কালীঘাটের বাড়িতে বসে খালি ফোন ঘুরিয়েছিলেন। প্রথমবার মুকুলদাদা ভোট করিয়ে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার কেষ্টদাদা। সঙ্গে পার্থদাদাও ছিলেন। মদনদাদা কেমন যেন 'লাল চুল, কানে দুল' হয়ে গিয়েছেন। ববিদাদা মিনি পাকিস্তান রক্ষায় ব্যস্ত। সত্যিই ভাইপো ছাড়া কেউ নেই আপনার পাশে।

সেই দু' বছর বয়স থেকে ভাইপো রাজনীতি করছে। তখন 'দিদি' বলতে গিয়ে 'ইডি' বলত। আপনার সঙ্গে লুকোচুরি খেলার সময়ে, 'ইডি টুকি, ইডি আমায় ধরতে পারে না' বলত। দেখুন দিদি, এখনও ভাইপোটা ছোটই রয়ে গেল। এখনও 'ইডি টুকি, ইডি আমায় ধরতে পারে না' বলে লুকোচুরি খেলে চলেছে। জীবনে প্রথমবার দু' মাসের জন্য বাংলা দেখতে বেরিয়েছিল। সেও ছড়িয়ে এসেছে। দলের পুরনো কর্মীদের বসিয়ে দিয়েছে। যাকে তাকে প্রার্থী করে দিয়েছে। ওর জেলায় খালি মারামারি, গোলাগুলি চলছে। কে একটা ওকে দুষ্টুমি করে 'ভাইপো চোর' বলে ডেকেছে অমনি গাড়ি থেকে নেমে ধাওয়া করেছে। পরে পুলিশ ধরে লোকটাকে খুব পিটিয়েছে, এক গুচ্ছ মামলাও দিয়েছে শুনছি। তবে গাড়ি থেকে নেমে ধাওয়া করাটা আপনার থেকেই শিখেছে দিদি। কিন্তু আমি বুঝলাম না ও কি সত্যই এখনও শিশু। 'জয় শ্রীরাম' তো গালাগাল আর 'ভাইপো চোর' তো দুষ্টুমি। ফারাকটাও বোঝে না।

দিদি ক্ষমতায় আসার পরে পঞ্চায়েত নির্বাচনের মতো ছোটো ভোটে আপনাকে বাড়ি থেকে বের হতেই দেখিনি। ঘরে বসে চপ-মুড়ি আর লিকার চা খেয়েছিলেন। লেঠেল বাহিনী ভোট করে নিয়েছে। আর এবার কি না কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ সব জায়গায় গিয়ে আপনাকেই ভোট চাইতে হচ্ছে! ভাবা যায়!

আপনিও তেমন। উত্তরবঙ্গ দিয়ে শুরু করেছেন। বুঝেছেন, ওখানে মানুষ বিজেপি ছাড়া কারও দিকে তাকাবে না। আপনি কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে মানুষকে লেলিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন হাতা, খুন্তি নিয়ে তাড়া করতে। কেন দিদি? ওঁরা আমাদের দেশের সম্মাননীয় বাহিনীর সদস্য। দেশ রক্ষার কাজ করে। আবার গত দশ বছরে যাঁদের চুরি করাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন তাঁদের ধরতে বলছেন। জানিয়েছেন, আপনাকে জানালেই কাজ হয়ে যাবে। শাস্তি পেতে হবে।

আচ্ছা দিদি, লোকসভায় বলেছিলেন ৪২ আসনেই আপনি প্রার্থী। এক ডজন আসন কমে গিয়েছিল। বিধানসভায় বলেছিলেন ২৯৪ কেন্দ্রেই আপনি প্রার্থী। নিজেই জিততে পারেননি। এবার পঞ্চায়েত কি ৭৬ হাজার না কত আসনে আপনিই প্রার্থী?

> **পাটনায় যে বৈঠক হলো সেটা তো আসলে রাজনৈতিক নয়। পারিবারিক বৈঠক। দুর্নীতির থেকে বাঁচতে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের যাদব, বাংলার বন্দ্যোপাধ্যায়, দিল্লির গান্ধী, মহারাষ্ট্রের ঠাকরে-সহ দশটি পরিবারের বৈঠক।**

তবে আপনার সেই পুরনো নাটকটা দেখতে পেয়ে আমার খুব ভালো লাগছে। কতদিন পরে দেখলাম বলতে পারব না তবে ভালো নাটক। লাস্টবার দেখেছিলাম রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে যখন আপনার মন্ত্রী অখিল গিরি অপমান করেছিল। আপনি অখিলের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নিয়ে নিজেই ঘটা করে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন। এবার দেখছি পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় আপনি সবার কাছে ক্ষমা চাইছেন। এই নাটকীয় দৃশ্যটা বাঙ্গালির চেনা হয়ে গিয়েছে। অনেক ক্ষমাও করেছে। কিন্তু আবার?

যে সিপিএম আর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আপনি দিনরাত গাল পারেন তাদের নেতাদের সঙ্গে পাটনায় গিয়ে বৈঠক করে এসে এখানে লড়াইয়ের কথা বলছেন। মানুষ কি সেটাও ক্ষমা করে দেবে? না, দিদি মনে হয় দেবে না। আমার না কেমন খটকা লাগছে। ভাইপোকে নিয়ে পাটনায় গিয়েছিলেন সেটা বেশ করেছেন। লালুপ্রসাদের কাছে গিয়ে ভাইপো জেলজীবনের নিয়মাবলী শিখে এসেছে কি না জানা নেই। কিন্তু নিলে পারত।

শেষে একটাই কথা। দিদি আমি জানি, আর কেউ জানে না। ওই যে পাটনায় বৈঠক হলো সেটা তো আসলে রাজনৈতিক নয়। পারিবারিক বৈঠক। দুর্নীতির থেকে বাঁচতে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের যাদব, বাংলার বন্দ্যোপাধ্যায়, দিল্লির গান্ধী, মহারাষ্ট্রের ঠাকরে-সহ দশটি পরিবারের বৈঠক। জম্মু-কাশ্মীরের বাপ-বেটির দলও ছিল। আমি চাই ওই পরিবারে সুখ আসুক। আপের কেজরিদাদা ওই পরিবারে ঢুকতে চাইবেন বলে তো মনে হয় না। তাই চিন্তা থাকছে।

দিদি প্রণাম নেবেন। আর ছোটো ভাইয়ের একটা কথা রাখবেন। ক্ষমা চাইবার সময়ে মনে মনে আমাকে বাদ দেবেন। ছোটো ভাই হিসাবে আপনাকে ক্ষমা করার ধৃষ্টতা আমি দেখাতে পারব না। □

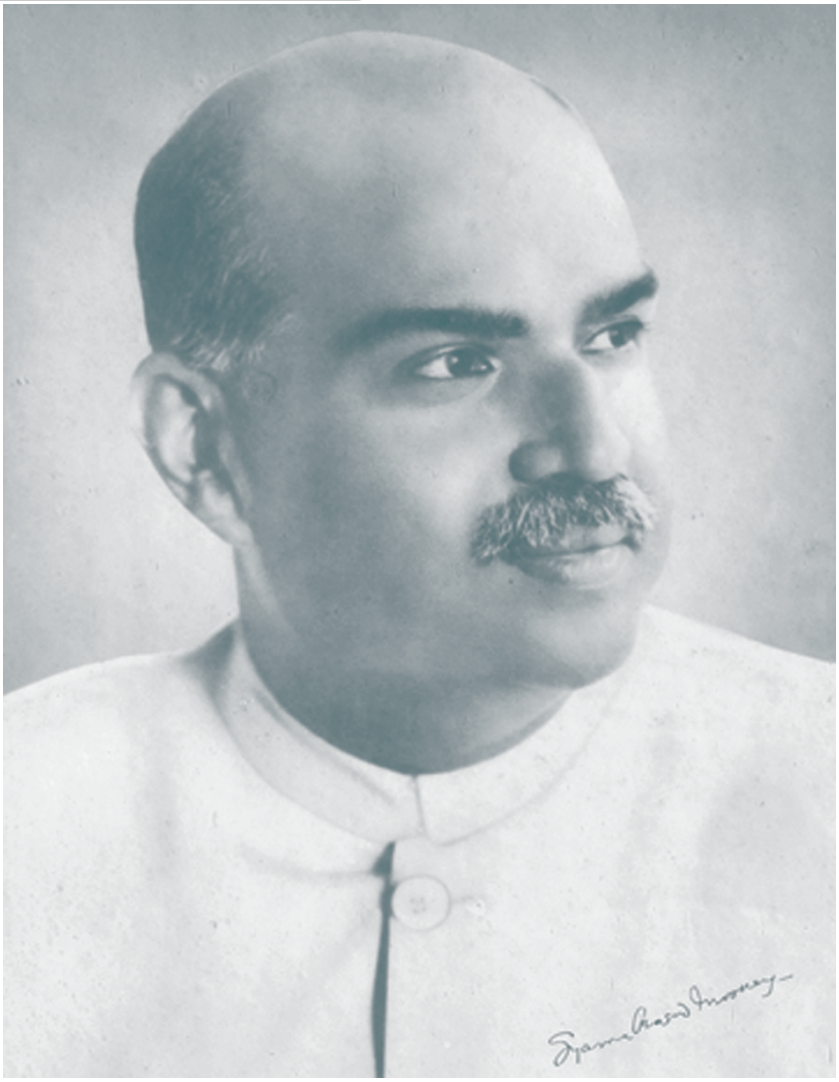

আধুনিক ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভাবনা

ড. জিষ্ণু বসু

ভারতবর্ষের ইতিহাসের কঠিনতম সময়ে যেসব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সমাজকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, শ্যামাপ্রসাদ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর অক্লান্ত প্রয়াসের জন্যই আজও বাঙ্গলার একটি অংশ পশ্চিমবঙ্গ হিসেবে ভারতবর্ষের মধ্যে রাখা সম্ভব হয়েছে। না হলে বাংলাদেশের মতো পশ্চিমবঙ্গ-সহ সমগ্র বঙ্গ একটি ইসলামি দেশে পরিণত হতো। সেই অনন্য অবদানের শ্রদ্ধাপূর্ণ স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে এক শিক্ষাবিদ একজন শিক্ষাপ্রশাসক ড. শ্যামাপ্রসাদের অবদান আজও নতুন করে বোঝার প্রয়োজন আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকনিষ্ঠ উপাচার্য হিসেবে অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। পরাধীন ভারতে তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলাভাষায় সমাবর্তন ভাষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে শিক্ষার অঙ্গনে সেটা ছিল প্রথম দেশীয় প্রতিবাদ। এই লেখাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পরাধীন ও স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদের অনবদ্য অবদানের বিষয়ে কিছু তথ্য উপস্থাপনের চেষ্টা করা হলো।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের শেষের দিকে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে অসাধারণ সাফল্য তা সারা পৃথিবীর সারস্বত জগতের সামনে বিস্ময়। একটি মত ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে যে ইংরেজ শাসনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ভারতবাসী প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবে বিজ্ঞানকে গ্রহণ করেছিলেন। ভারতবর্ষ একটি প্রাচীন সভ্যতার দেশ। সেই দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাচীন ঐতিহ্যকে স্মরণ করে যুব বিজ্ঞানী সমাজ নিজেদের বিজ্ঞানকেন্দ্রিক জীবন রচনা করেছিলেন। তাঁরা মনে করতেন, বিশ্বসভায় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের সাফল্য একটি পরাধীন দেশের মানুষের দেশমাতৃকার জন্য সংগ্রাম। এই পর্যায়ে ১৯০২ সালে প্রকাশিত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের গ্রন্থ, 'দ্য হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি' বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল। যুবমানসে এই গ্রন্থ এতটাই গভীর প্রভাব ফেলেছিল যে ১৯০৯ সালে আচার্য তাঁর বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সাফল্য, চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরমনের বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি সাধারণ জনমানসে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

আজ সারা পৃথিবীর মানুষ মেনে নিয়েছেন, বিংশ শতাব্দী প্রথমার্ধে বিজ্ঞানের যে অসাধারণ সাফল্য ভারতবর্ষ দেখিয়েছে, তা তার হাজার হাজার বছরের সাধনার ধারাবাহিকতা।

এদেশের মাটিতেই গণিতের দশমিক পদ্ধতি এবং শূন্য আবিষ্কার হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার করেছে, মরিচাহীন ইস্পাত তৈরি করেছে শত শত বছর আগে। এই গভীর এবং প্রাচীন ঐতিহ্যকে স্মরণ করেই নতুন ভারতে আত্মবিশ্বাস এসেছিল। এই নবজাগরণের কাজে সব থেকে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল বঙ্গ প্রদেশ। সে যুগে অসামান্য প্রতিভাবান বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন শিক্ষা প্রশাসকের অনবদ্য ভূমিকা ছিল। এইসব মনীষীর মধ্যে মহেন্দ্রলাল সরকার, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার তারকনাথ পালিত এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম প্রণিধান যোগ্য।

ড. মহেন্দ্রলাল সরকার ১৮৭৬ সালে ইন্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স (আইএসিএস) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরমন ইন্ডিয়ান ফাইন্যান্স সার্ভিসে চাকরি করতেন। তিনি বিজ্ঞানের চর্চা করতেন আইএসিএস-এর পরীক্ষাগারে। ১৯২৩ সালে তিনি 'রমণ এফেক্ট' আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পেলেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় আবার এই বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির কথা উঠে এল। উচ্চশিক্ষার মধ্যে বিজ্ঞানকে আনতেই হবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের চর্চার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন দানা বাঁধল গঠিত হলো বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ। স্যার তারকনাথ পালিত আর রাসবিহারী ঘোষ এই বিজ্ঞানের প্রসারে প্রায় সাইত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেছিলেন। সেদিন তারকনাথ বললেন, 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার প্রচার ও প্রসার প্রয়োজন বিজ্ঞানের বিকাশ ও প্রগতির জন্য। শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং ফলিত বিদ্যার পরিসরে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে জগদীশ চন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতো পথপ্রদর্শক মহাপুরুষদের পরে এই বিষয়টির একটি পরিকাঠামো তৈরি করতে পেরেছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে ১৯১৪ সালের মার্চ মাসে প্রতিষ্ঠিত হলো 'ইউনিভার্সিটি কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি' যাকে সকলের কাছে ধীরে ধীরে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ হিসেবে পরিচিত হতে থাকে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, সিভি রমণ, গণেশ প্রসাদ ও শিশিরকুমার মিত্রের মতো অধ্যাপকেরা এই ইউনিভার্সিটি কলেজকে বিজ্ঞানের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করলেন। এই মহপ্রয়াসের ফল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া গেল। ১৯১৫ সালের এমএসসি ব্যাচের ছাত্ররা সারা বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিলেন। সেই দলে ছিলেন সতেন্দ্রনাথ বোস, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জির মতো বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানীরা।

এই অসাধ্য সাধনে পিতা-পুত্র স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। স্যার আশুতোষ ১৯০৬ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত দু' বছর দু' বছর করে মোট চার বার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। সারা দেশ থেকে আর্থিক সহযোগিতা সংগ্রহ করে এক একটি চেয়ার প্রফেসরের পদ তৈরি করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত, পদার্থবিদ্যা আর জীববিজ্ঞানের কয়েকটি শক্তিশালী বিভাগ তৈরি হয়ে গেল।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকনিষ্ঠ উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পেলেন ১৯৩৪ সালে। মাত্র ৩৩ বছরের এই উপাচার্য সেই ঔপনিবেশিক শাসনকালে কয়েকটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। প্রথাগত শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'ডিসটিংগুইশ প্রফেসর' হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। উপাচার্য হিসেবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বললেন, 'যদিও অনেকেই বলছেন পশ্চিমি শিক্ষা আমাদের মধ্যে গভীর দেশাত্মবোধ, মুক্তচিন্তা আর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটিয়েছে, কিন্তু আমি এর মধ্যে কোনো স্পষ্ট জাতীয় শিক্ষানীতি দেখতে পাইনি।' শ্যামাপ্রসাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত কেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। আই.এ. বা ইন্টারমিডিয়েট পাঠ্যসূচিতে প্রত্নতত্ত্ব বিষয়টি শুরু করেন। বিএসসি. পাঠ্যক্রমে জ্যোতির্বিদ্যা যোগ করেন তিনি। ১৯৩৭ সালে এম.ডি.এম. পাঠক্রমের সময়কাল ৬ বছর থেকে কমিয়ে পাঁচ বছর করেন।

শ্যামাপ্রসাদ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, 'আমাদের দেশে পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞা সংগৃহীত হয়েছে, কিন্তু জনজীবনে তাঁর সামান্যই প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে। সাধারণ মানুষের জীবনে সমৃদ্ধি, আনন্দ ও প্রফুল্লতা তখনই আসবে, যখন বিজ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে শিল্প, কৃষি, নগরের পয়ঃপ্রণালী, জনসাধারণের সুষ্ঠু বিকাশের কাজে লাগবে। তাহলেই কোটি কোটি মানুষের দারিদ্র, রোগভোগ আর অজ্ঞতার থেকে মুক্ত করবে।'

উপাচার্য হিসেবে তিনি 'মাস-স্কেল প্রোডাকশান' বিষয় ফলিত উপার্থবিদ্যা বিভাগে পড়ানো শুরু করেন। ফলিত রসায়ন বিভাগে শিল্পজাত পণ্য তৈরি করার প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করেন ড. শ্যামাপ্রসাদ। তাঁর সময়েই 'কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং' কোর্স কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয়। বিএসসি কোর্সের মধ্যে 'পরীক্ষামূলক মনোবিদ্যা' সংযুক্ত হয়। তিনিই বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিজ্ঞানের একটি ডিপ্লোমা কোর্স শুরু করেন।

১৯৩৫ সালের ৩ জানুয়ারিতে 'ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের' উদ্বোধনী ভাষণে শ্যামাপ্রসাদ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কলটিভেশন অব সায়েন্স এবং বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে তিনটি সংস্থা কলকাতার সুনাম এবং গৌরব বৃদ্ধি করেছে— এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, বোস ইন্সটিটিউট এবং ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অব সায়েন্স।'

১৯৩৮ সালে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন অব সায়েন্স আর ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশন যৌথভাবে সম্মেলন করে। সেই বিজ্ঞান মহাসভায় ড. শ্যামাপ্রসাদ বলেন, 'আগেকার ধারণা ছিল ভারতীয় জনমনে কেবল পৌরাণিক ধারণাই বাসা বেঁধে আছে, আর বিজ্ঞানের ঠিকঠাক গবেষণা বা প্রয়োগে তাদের বিশেষ যোগদান নেই। আজ কিন্তু ভারতবর্ষ কেবলমাত্র স্বপ্ন দেখে না, ভারতের স্বর্ণযুগে দেশের বার্তাবাহীরা তার সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। চরক ও সুশ্রুত, নাগার্জুন ও ভাস্করাচার্য, আর্যভট্ট ও লীলাবতী এমন আরও অনেকে প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করেছেন,

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের অবদানে পরবর্তী প্রজন্ম উপকৃত হয়েছে...।' সবশেষে বলেন, 'ঐতিহ্য ও ভাবনার উন্নত প্রয়োগে এবং ফলিত গবেষণায় সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ আজ পৃথিবীর অগ্রণী সভ্যতার সঙ্গে একাসনে বসাবার অধিকার নিয়ে অগ্রসর হয়েছে।'

স্বাধীন ভারতবর্ষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার প্রসারে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী হিসেবে তিনি নতুন নতুন বিজ্ঞান গবেষণালব্ধ জ্ঞানের শিল্পায়নের প্রচেষ্টার ব্যবস্থা করেছিলেন। দ্য কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (সিএসআইআর)-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে গুরুদায়িত্ব পালন করেন। প্রথম পাঁচটি সিএসআইআর ল্যাবরেটরি তাঁর হাতেই হয়। দ্য ন্যাশনাল কেমিক্যাল ন্যাবরেটরি, দ্য ন্যাশেনাল ফিজিক্যাল ন্যাবরেটরি, দ্য ফুয়েল রিসার্চ স্টেশন, সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট এবং দ্য ন্যাশনাল মেটালারজিকাল ল্যাবরেটরি সেই প্রথম পাঁচটি সংস্থা। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স (আইআইএসসি) ব্যাঙ্গালোরের কোর্ট মেম্বার হিসেবেও মনোনীত হয়েছিলেন।

১৯৪৮ সালের ১১ এপ্রিল কলকাতার ইন্সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের উৎঘাটন করেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা ১৯৩৯ সালে নিউক্লিয়ার ফিসানের আবিষ্কারের পর থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএসসি পাঠক্রমে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স শুরু করেছিলেন। অধ্যাপক সাহা এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গকে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত করার আন্দোলনে এই দুই মহামানব কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিলেন। এই মনীষীদের প্রয়াসেই ১৯৪৮ সালে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের এই সংস্থা স্থাপিত হয়। আজ এই সংস্থা 'সাহা ইন্সটিটিউট নিউক্লিয়ার ফিজিক্স' দেশের পরমাণু শক্তি দপ্তরের একটি ইউনিট। এই পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের শিলান্যাসের অনুষ্ঠানের ভাষণে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'পরমাণু যুগের এই প্রভাত বেলায় আজ নিজেদের সেই মানুষটির মতো মনে হচ্ছে যিনি প্রথম আগুন আবিষ্কার করেছিলেন। রান্নার কাজে, ঘর গরম করার জন্য আলোর উৎস হিসেবে আগুনের ব্যবহার হয়েছে। কদাচিৎ শত্রুকে বা তাদের ঘরসম্পত্তি পুড়িয়ে দেওয়ার জন্যও। কিন্তু আগুনের প্রথম আবিষ্কারক সেদিন স্বপ্নেও ভাবেননি এই অগ্নি একদিন স্টিম ইঞ্জিন, রেলগাড়ি, টারবাইন বা সেন্ট্রাল হিটিং সিস্টেমের কাজে ব্যবহৃত হবে। আগুনের প্রথম আবিষ্কারের দিন আর শিল্পক্ষেত্রে ব্যাপক প্রয়োগের মাঝে কয়েক শতাব্দী চলে গেছে। যে আমি অত্যন্ত আনন্দিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিউক্লিয়ার ফিজিক্স বিষয়ে মৌলিক গবেষণার জন্য একটি পূর্ণাবয়ব বিভাগের মতো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।'

আজ স্বাধীনতার ৭৫ বছর ভারতমাতার এই বরেণ্য সন্তানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষাঙ্গনে গৌরবোজ্জ্বল উপস্থিতিকে বিস্তৃতভাবে চর্চা ও গবেষণা প্রয়োজন। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বহুমুখী প্রতিভার এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। □

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, গত জন্মাষ্টমী '২২ থেকে স্বস্তিকার ৭৫ বছর পালনের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই অবসরে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। সংরক্ষণযোগ্য এই গ্রন্থটি স্বস্তিকায় এযাবৎ প্রকাশিত বিশিষ্ট লেখকদের নির্বাচিত রচনার সংকলন। এটি আগামী অক্টোবর '২৩-এ প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা।

গ্রন্থটির মূল্য ধার্য করা হয়েছে ৪০০ টাকা।

প্রকাশ পূর্ব মূল্য ৩০০ টাকা (অর্থাৎ ১৫ আগস্ট, ২০২৩ -এর মধ্যে যাঁরা সম্পূর্ণ টাকা জমা দিয়ে কপি বুক করবেন তাদের জন্য)।

১৫ জুন, ২০২৩ থেকে অনলাইনে ওই টাকা পাঠানো যাবে। অনলাইনে টাকা পাঠালে নিচের দেওয়া ফোন নম্বরে অবশ্যই জানিয়ে দেবেন। জেলা অনুসারে তালিকা-সহ টাকা জমা করতে পারেন।

যোগাযোগ—

শ্রী তপন সাহা — ৯৯০৩০০২৯০১

শ্রী মহিম দাস — ৯৪৭৭৩৯৯২৯৭

অনলাইনে টাকা পাঠানোর Bank Details—

Name - Swastik Prakashan Trust
Bank - Punjab National Bank
Branch- Vivekanand Road, Kolkata-700006
A/c. No. - 0954000100121397
IFS Code - PUNB0095400

বিঃ দ্রঃ— নগদ টাকা স্বস্তিকা দপ্তরেই জমা দিতে হবে।
চেক দিলে Swastik Prakashan Trust—এই নামে চেক কাটতে হবে।

শিক্ষাবিদ হিসেবে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রকৃত মূল্যায়ন হয়নি

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

মন্ত্রিত্ব, রাজনীতি, সেবাকাজ ইত্যাদি বাদ দিলেও স্রেফ কলকাতার মতো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রয়াত উপাচার্য হিসেবে অন্তত জন্মদিনে একটি হলেও মালা প্রাপ্য হয় তাঁর, হিন্দু বাঙ্গালির জন্য রাজনীতি করতে গিয়ে, বাঙ্গালি হিন্দুর শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে 'পশ্চিমবঙ্গ'-কে পাকিস্তান থেকে কেটে এনে দিতে গিয়ে, এক দেশ, এক কানুন, এক নিশানের দাবিতে লড়তে গিয়ে 'সাম্প্রদায়িক' পদবাচ্য হয়ে শাসকের মালা হারিয়েছেন তিনি। তাতে অবশ্য তাঁর বিন্দুমাত্র সম্মান কমেনি কোনোদিনই। যতদিন গিয়েছে, বাঙ্গালি মানসে তিনি ক্রমেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছেন। আজকের দিনে অনেকানেক অমেরুদণ্ডী শিক্ষাবিদের বিপ্রতীপে তিনি এক প্রবল প্রতাপ পুরুষ সিংহ। তোতাপাখির মতো বুলি শেখানো শিক্ষাবিদেরা প্রতিষ্ঠানে যে কতখানি অপ্রাসঙ্গিক, তা শ্যামাপ্রসাদকে সামনে রেখে পরিমাপ করে বুঝতে পারি আমরা।

ছাত্রাবস্থায় জেনেছিলাম, অনাথ ছাত্রদের প্রতি শ্যামাপ্রসাদের বিশেষ স্নেহমমতা ছিল। অকালে বাবাকে হারিয়ে কার্যত অনাথ হয়ে পড়েছিলাম, তাই রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমে আমার ঠাঁই হলো। সেখানে একটি অনাথ ছাত্রাবাসের নাম 'হিন্দু মহাসভা ধাম'। তখন ক্লাস এইটে পড়ি। সাধারণভাবে বিভিন্ন হোস্টেলের নাম 'ব্রহ্মানন্দ ধাম', 'শিবানন্দ ধাম' 'যোগানন্দ ধাম' ইত্যাদি হতো জানতাম। কিন্তু তার মধ্যে 'অন্য জাতীয় শব্দ' 'হিন্দু মহাসভা ধাম' কীভাবে হয়ে গেল, তার যোগ্য জবাব খুঁজে পাচ্ছিলাম না তখন। মিশনের সবচাইতে প্রাচীন আশ্রমিক বিধূভষণ নন্দ আমার যাবতীয় প্রশ্নের মীমাংসা করে দিয়েছিলেন। জানলাম রহড়া বালকাশ্রমে হিন্দুমহাসভার দানও আছে। ১৯৪৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর ৩৭ জন বালক-নারায়ণকে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় বালকাশ্রম। প্রথম কর্মসচিব স্বামী পুণ্যানন্দজী মহারাজ। তাঁর সঙ্গে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সভাপতি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সুসম্পর্ক ছিল। ১৯৪৫ সালে পুণ্যানন্দজীর আমন্ত্রণে শ্যামাপ্রসাদ খড়দায় এসেছিলেন কেবল হিন্দু মহাসভার নেতা হিসেবে নয়, একজন শিক্ষাবিদ হিসেবেও। তিনি এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা কী হবে, তা নিয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা ছকে দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। রহড়ায় পবর্তীকালে অনাথ ছেলেদের কর্মসংস্থানমুখী কারিগরি শিক্ষার পরিকল্পনা সম্ভবত শ্যামাপ্রসাদেরই মানস-ভাবনা। এখানকার ছেলেরা খেলাধুলা, সংগীত, অভিনয়— সব বিষয়ে শিক্ষার সুযোগ পাবে এমনটাই চেয়েছিলেন, জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শী বিধূ মাস্টারমশাই।

হিন্দু মহাসভার কর্ণধার ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে তার আগে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতো। বাংলাদেশে খুলনার সেনহাটি হাইস্কুল ছিল এই রকম একটি প্রতিষ্ঠান। নানান কারণে শ্যামাপ্রসাদ এই স্কুলটি চালাতে পারছিলেন না। তিনি পুণ্যানন্দজীর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন এবং এই সমস্ত ছেলেকে পাঠাতে চাইলেন রামকৃষ্ণ মিশনে। স্বামীজী রাজি হলেন। পরবর্তীকালে ওই ছাত্রদের জন্য গৃহ নির্মাণের ব্যাপারে তিনি হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে একটি বড়ো অঙ্কের টাকা দান করলেন। এই টাকায় তৈরি হয়েছিল 'হিন্দু মহাসভা ধাম'। ১৯৪৫ সালে শ্যামাপ্রসাদ রহড়ায় এসেছিলেন ছাত্রদের দেখতে। ছাত্রদলের মধ্যে ছিলেন সেনহাটি হাইস্কুলের ছাত্র কৃষ্ণকমল চক্রবর্তী বা কেষ্ট, যিনি পরবর্তীকালে হয়ে উঠেছিলেন স্বামী নিত্যানন্দ বা কেষ্ট মহারাজ, রহড়া বালকাশ্রমের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ তথা বারাকপুরে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা।

কৃষ্ণকমল হিন্দু মহাসভার শাখা কেন্দ্র কলকাতার কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে ৮নং শিবনারায়ণ দাস লেনের স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। কিছুদিন পর চলে গেলেন হিন্দুমহাসভার খুলনার সেনহাটি হাইস্কুলে। মহাসভার স্কুল উঠে গেলে ১৯৪৪ সালের গোড়ায় কলকাতার ১০নং নলিন সরকার স্ট্রিটে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ব্যবস্থাপনায় স্বামী পুণ্যানন্দের কাছে উপস্থিত হলেন তিনি। স্বামী নিত্যানন্দ মহারাজ বারাকপুর রামকৃষ্ণ মিশনের মুখপত্র 'তত্ত্বমসি' পত্রিকায় লিখেছিলেন রহড়া বালকাশ্রমের ইতিহাস। তিনি জানিয়েছেন, ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষের পর তাঁর মেজদি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে ধরে হিন্দুমহাসভা পরিচালিত একটি ছাত্রাবাসে তাঁকে ভর্তি করে দেন। জানা যায়, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ততার কারণে আসতে না পারলেও অনাথ ছাত্রদের তিনি খোঁজখবর নিতেন। অনাথ ছাত্রদের জন্য শ্যামাপ্রসাদের বেদনার্ত হৃদয়, তাঁর সেবাকাজ, আর্তত্রাণের ইতিহাসও বোধহয় হারিয়ে যায়নি। শ্যামাপ্রসাদ নিয়ে গবেষণা করলে একটি সময় 'সাম্প্রদায়িক পদবাচ্য' হতে হতো। ভয়ে-ভক্তিতে তাই সে পথে বিশেষ কেউ আর যাননি। শিক্ষাবিদ হিসেবে তাঁর টুকরো টুকরো বহু উদাহরণ জুড়ে যদি আঞ্চলিক ইতিহাস উপাদানের পুঁথি গাঁথা হয়, তবে সামগ্রিক ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব হবে।

এবার বলি এক 'বাঘ'-এর ছেলে ছিলেন এক 'সিংহ' (স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে 'বাংলার বাঘ' নামে ডাকা হতো, আর ড. শ্যামাপ্রসাদকে সাংসদ হিসাবে দক্ষতার জন্য ডাকা হতো 'ভারত কেশরী')। 'বাপ কা বেটা'— সবাই বলতেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মনে করতেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে অভাব অভিযোগ জানানোর একমাত্র পাত্র হচ্ছেন শ্যামাপ্রসাদ। ১৯২৫ সালে একটি চিঠিতে প্রফুল্লচন্দ্র লিখছেন, 'ইউনিভার্সিটির ব্যাপারে

LUXMI TEA CO. PRIVATE LIMITED

17, R. N. Mukherjee Road, Kishore Bhawan, Kolkata-700 001
Phone No. 2248 4437/4227, Fax No. 2243 0177
E-mail : mail@luxmitea.com, Web.: www.luxmigroup.in

GROUP GARDENS

NARAYANPUR T.E.
SHYAMGURI T.E.
MONMOHINIPUR T.E.
MANOBAG T.E.
BHUYANKHAT T.E.
MANU VALLEY T.E.
GOLOKPUR T.E.
PEARACHERRA T.E.
JAGANNATHPUR T.E.
SAROJINI T.E.
FULBARI T.E.
URRUNABUND T.E.
MAKAIBARI T.E.
KENDUGURI T.E.
MORAN T.E.
SEPON T.E.
ATTABARIE T.E.
LEPTKATTA T.E.
ADDABARI T.E.
DIRAI T.E.
MAHAKALI T.E.

With Best Compliments
from -

AMBUJA NEOTIA

তুমি দেখিতেছি বাপ কা বেটা হইয়াছো। কেননা এত অক্লান্ত পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ কেহই করিতে পারিবে না।' ১৯৩৪ সালের ৮ আগস্ট মাত্র ৩৩ বছর বয়সে ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য পদে আসীন হলেন শ্যামাপ্রসাদ। পিতা-পুত্র কোনো একটি ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রসরতাকে প্রবল গতিসম্পন্ন করেছেন, এমন উদাহরণ সম্ভবত একটিই— উপাচার্য হিসেবে স্যার আশুতোষ মুখার্জি এবং তার উত্তরাধিকারী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। অনেকে মনে করেন, আশুতোষের মৃত্যুর পরই 'উপাচার্য' হয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। আসলে তা নয়, পিতার মৃত্যুর অন্তত দশ বছর বাদে তিনি উপাচার্য হন এবং উপাচার্য হবার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক নানা কাজ তিনি দক্ষতার সঙ্গে সামলে, নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেই পদে আসীন হয়েছিলেন।

আশুতোষের প্রয়াণের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে উৎকর্ষতার প্রবল অভাব অনুভূত হয়েছিল। একাগ্রতায়, অধ্যবসায়ে, সাধনায় ও প্রজ্ঞায় তা পূরণ করে দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। পাঠক্রমে ও প্রশাসনে পিতা-পুত্র উভয়েই উল্লেখযোগ্য রূপান্তর সাধন করেছিলেন। আশুতোষের হাতে উপাচার্যের দায়িত্ব ছিল ১৯০৬ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় দফায় ১৯২১ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত। তবে এটা ঠিক, জীবদ্দশায় পিতার শিক্ষাচিন্তার সঙ্গে সম্যক পরিচিতি লাভ করার সুযোগ পেয়েছিলেন পুত্র। সামান্য সময়ের জন্য হলেও পরিচালনার কাজ একসঙ্গে করার সুযোগ ঘটেছিল। কারণ ১৯২৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য মনোনীত হন তিনি। তার কয়েকমাস বাদে পিতার মৃত্যু ঘটে। তারপর তিনি সিন্ডিকেটেরও সদস্য হলেন। তখন তার বয়স মোটে ২৩। ১৯৩৪ থেকে '৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি উপাচার্য ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্বর্ণযুগ' বলতে যা বোঝায়, তা হলো তাঁর পিতার ১০ বছর এবং পুত্রের চার বছর মেয়াদি উপাচার্য পদে আসীন হবার কালপর্ব। অনেকের মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কুশলী প্রশাসক হিসেবে শ্যামাপ্রসাদ নির্ধারিত সময়ের অনেকদিন আগে এবং পরেও কাজ করে গেছেন, তা De facto উপাচার্যের মতোই। ১৯৩৪ থেকে হলেন De jure উপাচার্য। বিদায়ী উপাচার্য স্যার হাসান সুরাবর্দিও তার নিয়োগে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

উপাচার্য পদ থেকে সরে যাবার পরও ১৯৫২ সাল পর্যন্ত শ্যামাপ্রসাদ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে বক্তব্য রেখেছেন, তার মধ্যে মৌলিক শিক্ষাচিন্তার নির্যাস পাওয়া যায়। ১৯৩৭ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে বললেন, পরাধীন ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত স্তরের মধ্যেই সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে। ভারতবর্ষে নানা প্রান্তে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যে বৈচিত্র্য রয়েছে, তার মধ্যে ঐক্যসূত্রটি তুলে আনা দরকার। যখন ১৯৪৩ সালে গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন ভাষণ দিচ্ছেন ততদিনে বুঝতে পেরে গেছেন ভারতের স্বাধীনতা অর্জন কেবল সময়ের অপেক্ষা, আসছেই। তাই উত্থাপন করলেন জাতীয় শিক্ষানীতির প্রসঙ্গ। এইভাবে বাঙ্গলার শিক্ষাবিদ হিসেবে ভারতে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে নিলেন তিনি। বললেন, জাতীয় শিক্ষার এমন একটি সুস্থ নীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার যা সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারে। তিনি কতকগুলি দিক চিহ্নিত করলেন যা পরবর্তীকালে দেশের শিক্ষাবিদদের কাছে পথনির্দেশ হয়ে উঠলো। যেমন, সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত জাতীয় ভাষাগুলির মাধ্যমে পঠনপাঠন ও পরীক্ষার ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়া, দেশের প্রয়োজন ও প্রত্যাশা মেটাতে পাঠ্যসূচি পুনর্বিন্যস্ত ও নবায়িত করা, ভারতীয় সভ্যতার মৌলিক উপাদানগুলির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক যুগের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির সুষ্ঠু সমন্বয়ের পদ্ধতি।

ড. শ্যামাপ্রসাদকে ত্রিভাষার প্রয়োজনীয়তার কথা সওয়াল করতে দেখা যায়। আঞ্চলিক ভাষা বা মাতৃভাষা, জাতীয় ভাষা যা ভারতের সর্বত্র যোগাযোগ রক্ষার ভাষা এবং আন্তর্জাতিক ভাষা যা বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে অপরিহার্য। ভাষা সম্পর্কে তিনি গোলমেলে হঠকারী সিদ্ধান্ত নেবার পক্ষপাতী ছিলেন না। ইংরেজি ভাষা ব্রিটিশের ভাষা বলে উপেক্ষাও তিনি করেননি, আবার প্রাচীনতম সংস্কৃত ভাষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে তার মধ্যেকার মণিমাণিক্য সংগ্রহে জোর দিতে বলেছেন, বিশেষত তার মধ্যে অনাবিষ্কৃত উপাদান সংগ্রহ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন।

নারী শিক্ষার প্রতি যত্নবান হতে শিক্ষাবিদ হিসেবেও তাঁর বিশিষ্ট অবদান রয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলাদের জন্য গার্হস্থ্যবিজ্ঞান (Home Science) পাঠ্যক্রমের সূচনা করেছিলেন তিনি। আরও যে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন সকলের, তা হলো কলকাতায় কৃষিবিদ্যা অধ্যয়নের ব্যবস্থা, ফলিত পদার্থবিদ্যায় Communication Engineering পাঠ্যক্রমের আয়োজন, শিক্ষকদের শিক্ষাদানে দক্ষ করে তুলতে টিচার্স ট্রেনিং কোর্সের প্রবর্তন, প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতির নিদর্শন সংরক্ষণ, চর্চা ও গবেষণার জন্য মিউজিয়াম স্থাপন ইত্যাদি।

শরীরচর্চা যে জাতি গঠনের অন্যতম বিষয়, তা বুঝেছিলেন তিনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে খেলাধুলার উন্নতিতে তার অনন্য পরিকল্পনা ও রূপায়ণ ছিল। ১. ছাত্রদের খেলাধুলা এবং ব্যায়াম চর্চার ব্যবস্থা করলেন। ২. ঢাকুরিয়া লেকে তৈরি হলো ইউনিভার্সিটি রোইং ক্লাব। ৩. তাঁরই উদ্যোগে তৈরি হলো ইউনিভার্সিটি অ্যাথলেটিক্স ক্লাব। ৪. ময়দানে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আলাদা খেলার মাঠের ব্যবস্থা হলো। □

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

With Best Compliments

From :-

EAST INDIA TRANSPORT AGENCY

(A Unit of E.I.T.A. India Limited)

20B, Abdul Hamid Street
4th Foor
Kolkata - 700 069
Phone : Nos. 22483203
Fax No. 22483195
Email : eita.cal@eitain.com

LAUREL

With Best Wishes From-

PRAKASH-PRAMOD BAID

Laurel Securities Private Limited

(Member of National Stock Exchange of India Ltd.)

LAUREL ADVISORY SERVICES
PRIVATE LIMITED
(Investment Advisor Mutual Fund Distributor)

JAIN BAID & COMPANY
(Chartered Accountants)

909-910, Diamond Heritage, 16, Strand Road, 9th Floor, Kolkata - 700001
Phone No. 66153334-39, Fax No. 66153341 Email ID - prakash_laurel@yahoo.com

হিন্দু শরণার্থী প্রসঙ্গে বনগাঁ সীমান্তে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সঙ্গে কথা বলছেন শ্যামাপ্রসাদ। সঙ্গে দেবেন্দ্র নাথ মুখার্জি।

নোয়াখালি ও কুমিল্লায় গণহত্যা প্রতিরোধ এবং মানবত্রাণে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা

বিমল শঙ্কর নন্দ

বিগত শতাব্দীর তিরিশের দশকের শেষের দিক থেকে অখণ্ড বাঙ্গলার পূর্বাংশে যে মানবনিধন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়েছিল সেগুলিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলে অভিহিত করার প্রবণতা এক শ্রেণীর ইতিহাসলেখকের আছে। কিন্তু দাঙ্গা শব্দটি তখনি ব্যবহার করা যায় যখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ পরস্পরের ওপর আঘাত হানে, মার ও পালটা মারের নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু আক্রমণকারী যখন হয় একটি পক্ষ এবং অপর পক্ষটি যখন কেবলই আক্রান্ত হয়, আক্রান্ত হয়ে প্রাণ ও সম্মান বাঁচানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে তখন দাঙ্গা বা রায়ট শব্দের ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। আক্রান্ত পক্ষের মানুষ যদি অসহায় ভাবে মারা যায়, পরিবারের মহিলাদের সম্মান নষ্ট হয় তখন হয়তো গণহত্যা, নরসংহার প্রভৃতি শব্দগুলো অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট মুসলিম লিগ পাকিস্তানের দাবিতে জিন্নার ডাকে যে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' উদ্‌যাপন করে সুরাবর্দি সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে তাতে প্রথম দু'দিন লিগের দুষ্কৃতীরা অসহায় ও নিরস্ত্র হিন্দুদের ওপর প্রাণঘাতী আক্রমণ চালিয়েছিল। কারণ সুরাবর্দি সরকার হিন্দুদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় কোনো উদ্যোগ নেয়নি। কিন্তু তৃতীয় দিন থেকে হিন্দু ও শিখরা রুখে দাঁড়ায়। তখন হঠাৎ করেই যেন সুরাবর্দি সরকার অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে। যাইহোক, ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে'-কে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া ঘটনাপ্রবাহকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আখ্যা দেওয়া যায়। অন্তত তর্কের খাতিরে।

কিন্তু ১০ অক্টোবর ১৯৪৬ থেকে নোয়াখালি এবং পরে কুমিল্লা-টিপ্পেরা (ত্রিপুরা)-তে অসহায় হিন্দুদের ওপর যে অবর্ণনীয় অত্যাচার সংঘটিত হয়েছিল তাকে কোনো অর্থেই দাঙ্গা বলা যায় না। এই স্থানগুলোতে যা ঘটেছিল তা হলো হিন্দুদের ওপর একতরফা আক্রমণ, লুঠপাট, জবরদস্তি ধর্মান্তরণ, মহিলাদের সম্ভ্রমহানি। হাজার হাজার হিন্দু নিহত হয়, ভয়াবহ নির্যাতন হয় মহিলাদের ওপর, দখল হয়ে যায় হিন্দুদের সম্পত্তি। যে মানুষগুলো প্রাণে বেঁচেছিল তারা উপদ্রুত অঞ্চল ছেড়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে চলে যেতে বাধ্য হয়। এই ভয়ংকর ঘটনাপ্রবাহকে ইংরেজিতে বলে এথনিক ক্লিনজিং। নোয়াখালি ও কুমিল্লা টিপ্পেরাতে ঠিক এটাই ঘটেছিল।

নোয়াখালি গণহত্যা কিংবা কুমিল্লার হিন্দু হত্যা এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার চরম রূপ যা শুরু হয়েছিল এর প্রায় দেড় দশক আগে। বিগত শতাব্দীর তিরিশের দশকের শুরু থেকেই অবিভক্ত বাঙ্গলার পূর্বাংশে হিন্দুদের ওপর নির্যাতন ও উৎপীড়ন ক্রমেই বাড়ছিল। এই নির্যাতনের প্রাবল্য দেখে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন, বাঙ্গলার জাগ্রত মনীষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর একাধিক বক্তব্যে এই সব ঘটনার নিন্দা করেছেন। হিন্দুদের অসহায়ভাবে মার খেতে দেখে ধিক্কার জানিয়েছেন। কখনো-বা প্রতিরোধের পরামর্শ দিয়েছেন। এর দু-একটির উদাহরণ দেওয়া যায়। ১৯৩১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর, বাংলা ২১ ভাদ্র ১৩৩৮ তারিখে বেশ কয়েকটি সংবাদপত্রে রবীন্দ্রনাথের একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। বিবৃতিটির অংশ বিশেষ এই রকম :

"বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে পরপর যে সকল নৃশংস অত্যাচার উৎপীড়ন অনুষ্ঠিত হইতেছে, উহা কেবল যে আমাদিগকে দুঃখিত করিয়াছে তাহা নহে, অসহনীয় লজ্জার বোঝাও আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছে। ইহা অতীব দুঃখের বিষয় যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আমাদের যে শ্রদ্ধা ছিল এই সকল অত্যাচার উৎপীড়নে তাহা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। বার বার অনায়াসে গ্রামের পর গ্রামে, শহরের পর শহরে এই সকল নৃশংসতার অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ সরকারের নৈতিক মর্যাদা অতিমাত্রায় আহত হইয়াছে।

কিন্তু আমাদের নিজেদের মধ্যেরই কোনো দল বিশেষকে যখন আমরা আমাদেরই বিদ্বেষের আগুন উসকাইয়া তুলিতে এবং আমাদের জাতীয় ইতিহাসকে চিরদিনের মতো কলঙ্কিত করিতে দেখি, তখন লজ্জায় সংকোচে আমরা নির্বাক হইয়া পড়ি। এতৎ

সম্পর্কে আমাদের সমবেত চেষ্টা দ্বারা নিজদিগকে রক্ষা করিবার কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, বলিতে ইহাই বুঝাইতে চাই যে একটি কার্যতৎপর নীতি সঙ্ঘ গঠন করিয়া আমাদের দেশের সকল সম্প্রদায়ের জনসাধারণকে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।'' এই বিবৃতিতেই মুসলমানদের উদ্দেশে কবি আহ্বান জানান--- ''সমস্ত সাধু-মুসলমানদেরকে তাঁহাদের মহান ধর্মের নামে, তাঁহাদের কৃষ্টি ও সভ্যতার নামে এবং বিপন্ন মানব-সমাজের নামে আমি আমাদের সহিত সহযোগিতা করিয়া, যে পাপ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া আমাদিগের উন্নতির সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থতার ডুবাইয়া দিয়া সমস্ত জগতের চক্ষে আমাদিগকে হীন ও উপহাস্যাস্পদ করিয়া ফেলিবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে তাহার উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান হইতে অনুরোধ করিতেছি।'' ১৯৩১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর ফ্রি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত একটি সংবাদে দেখা যায়— ''চট্টগ্রামে সম্প্রতি হিন্দুদিগের প্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছে উক্ত ঘটনায় কবি রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছেন। তিনি চট্টগ্রামের উৎপীড়িত অধিবাসীদের সাহায্যকল্পে অগ্রসর হইয়াছেন। ফ্রি প্রেস সানন্দে জানাইতেছে যে, কবি রবীন্দ্রনাথ গত সোমবারের গীত উৎসবের উদ্বৃত্ত টাকা হইতে উক্ত উৎপীড়িতদের সাহায্যার্থে ১০০০ টাকা দিবেন এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।'' ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় বাঙ্গলার পূর্বাংশে হিন্দুদের নিপীড়িত হওয়ার এক করুণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় :

উপদ্রুত হিন্দু : চট্টগ্রামের উপদ্রুত হিন্দুদের সাহায্যের জন্য কবি রবীন্দ্রনাথ অভিনয়লব্ধ অর্থ হইতে সহস্র মুদ্রা দান করিবার সংকল্প করিয়াছেন। সংখ্যায় ও নানাভাবে দুর্বল হিন্দুর উপর এই অকথ্য পীড়নের সংবাদে কবির হৃদয় ব্যথিত হইয়াছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভাও সমগ্র হিন্দুসমাজকে চট্টগ্রামের হিন্দুদেরকে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন এবং অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা দেখিতেছেন...

পাবনা, ঢাকা, কিশোরগঞ্জ ও চট্টগ্রামে কয়েক বৎসরের লুঠতরাজ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা হইতে ইহা স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে, উত্তর ও পূর্ববঙ্গের সংখ্যাল্প শতবাবিচ্ছিন্ন হিন্দুরা আত্মরক্ষায় অক্ষম। ধর্মের ধুয়া ছলনা মাত্র— রাজনৈতিক কারণই মুখ্য। রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতা আজ রাষ্ট্রনীতিতে প্রবল হইয়া যে ভেদবাদের সৃষ্টি করিয়াছে, যেভাবে বিদ্বেষ মর্মান্তিক করিয়া তুলিতেছে, এ সকল তাহারই অভিব্যক্তি।'' প্রতিবেদনের একটা ক্ষুদ্র অংশই এখানে উল্লেখিত হয়েছে। এই প্রতিবেদনের ছত্রে ছত্রে অখণ্ড বঙ্গের উত্তর এবং পূর্বাংশে হিন্দুদের ওপর ভয়াবহ অত্যাচারের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধভাবে এর মোকাবিলা করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বিগত শতাব্দীর তিরিশের দশকের প্রথম থেকেই অবিভক্ত বঙ্গের উত্তর এবং পূর্বাংশের মুসলমান প্রধান অঞ্চলে হিন্দুদের ওপর সংগঠিত হামলা শুরু হয়। অত্যাচার তার আগেও চলতো, তবে বিক্ষিপ্তভাবে। তিরিশের দশক থেকে তা সংগঠিত আকার নেয়। সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর 'যুক্তবঙ্গের স্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন : 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাঁদের চার বছরের ভিতরেই মুসলমান মানসে একটা ভাব বিপ্লব ঘটে যায়। হিন্দুয়ানীর কোনো ধারই তারা ধারবে না। সেটা যদি হয় বাঙ্গালিয়ানা তা হলেও না। উচ্চপদস্থ, নিম্নপদস্থ সব স্তরের মুসলমানকে আমি ধুতি পরতে দেখেছিলাম। নামও অনেকের হিন্দু নাম। কিন্তু ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন যেন মুসলমান আমলের পুনরারম্ভ।'

১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে বাঙ্গলায় মুসলিম লিগ ভালো ফল করে। অন্যান্য প্রাদেশিক আইন সভাগুলিতেও মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলিতে বিপুল জয় পায় লিগ। কিন্তু কোথাও সরকার গঠন করার মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। বাঙ্গলাতেও তাদের ক্ষমতা থেকে দূরে রাখা সম্ভব হতো যদি কংগ্রেস দল এবং ফজলুল হকের কৃষক প্রজাপার্টির কোয়ালিশন গঠিত হতো। কিন্তু কোয়ালিশন গঠনে কংগ্রেসের অনীহার কারণে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে মুসলিম লিগের আঁতাত হয়ে যায়। ফজলুল হককে সামনে রেখে ক্ষমতার অলিন্দে ঢুকে পড়ে মুসলিম লিগ। অন্নদাশঙ্কর রায়ের ভাষায় বাঙ্গলায় মুসলমান আমলের পুনরারম্ভ হয়। নোয়াখালি ও কুমিল্লার গণহত্যার বীজ তখনই পোঁতা হয়ে গিয়েছিল।

১৯৪৬-এর প্রাদেশিক আইনসভা নির্বাচনে মুসলিম লিগ অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করে। সুরাবর্দির নেতৃত্বে সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুসলিম লিগ হয়ে ওঠে রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘ। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ওপর শুরু হয় মাত্রাছাড়া জুলুমবাজি। ১৯৪৬ সালের ৪ জানুয়ারি বরিশাল থেকে কংগ্রেস নেতা সতীন সেন গান্ধীজীকে লেখেন যে মুসলিম লিগ ক্রমেই আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে। এই সময়ে ঢাকা থেকে একদল কংগ্রেস কর্মী গান্ধীজীকে চিঠি লেখেন যে পূর্ববঙ্গে হিন্দুরা ধর্মাচরণে বাধা পাচ্ছে। বিভিন্ন গোলমালে হিন্দুদেরই ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। পুজোর পর ঠাকুরের প্রতিমা বিসর্জনেও সমস্যা হচ্ছে। এর মধ্যেই ঘটে যায় ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট কলকাতার দাঙ্গা এবং ১০ অক্টোবর থেকে ঘটে যাওয়া নোয়াখালি ও কুমিল্লা-টিপ্পেরায় (ত্রিপুরা) হিন্দুদের হত্যা। কলকাতায় ঘটে যাওয়া দাঙ্গাকে পুরোপুরি সফল করতে ব্যর্থ হয়েছিল মুসলিম লিগ। কারণ প্রথম দুদিন ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হওয়ার পর হিন্দুরাও রুখে দাঁড়ায়। শুরু করে পালটা আক্রমণ। শ্যামাপ্রসাদের হাতে গড়ে ওঠা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিন্দুস্থান ন্যাশনাল গার্ড হিন্দুদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। অবিভক্ত বাঙ্গলার পূর্বাংশের হিন্দুদের মনে আতঙ্ক তৈরি করতে মুসলিম লিগ তখন একটি নতুন পন্থা নেয়। বেছে নেওয়া হয় নোয়াখালি জেলাকে যা অবিভক্ত বাঙ্গলার বৃহত্তম মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা (৮২%)। হিন্দুরা অতি সংখ্যালঘু (মাত্র ১৮%)। হিন্দুরা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে। হিন্দু গণহত্যার নেপথ্যে ছিল লিগ নিয়ন্ত্রিত সরকারের প্রশাসনিক মদত।

এই গণহত্যার কুখ্যাত নায়ক ছিল গোলাম সারওয়ার যে ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে জিতলেও ১৯৪৬-এর নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিল। গোলাম সারওয়ারের নেতৃত্বে ১৯৪৬ সালের ১০ অক্টোবর লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন শুরু হয় হিন্দুদের ওপর আক্রমণ। ড. দীনেশ চন্দ্র সিংহ, অশোক দাশগুপ্ত এবং আশিস চৌধুরী তাঁদের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'The Grat Calcutta Killings and Noakhali Genocide : A Historical Study' এবং দীনেশ চন্দ্র সিংহ তাঁর 'শ্যামাপ্রসাদ, বঙ্গবিভাগ এবং পশ্চিমবঙ্গ' গ্রন্থে এই গণহত্যার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। সব ঘটনাই অত্যন্ত মর্মান্তিক এবং হৃদয় বিদারক। নারায়ণপুরে জমিদার সুরেন্দ্রনাথ বসুর হত্যাকাণ্ড, করপাড়ায় আইনজীবী রাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরীকে সপরিবারে হত্যা, গোনাইবাগে এক পরিবারের ১৯ জনকে হত্যা, নোয়াখালির চৌধুরী বাড়িতে একসঙ্গে ৮ জনকে হত্যা, গোবিন্দপুরে একসঙ্গে ১৬ জন মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা— এগুলি

অজস্র ঘটনার গুটিকয় খণ্ডচিত্র। হিন্দুদের ওপর আক্রমণগুলি অত্যাচারের চিরাচরিত পদ্ধতি ধরেই অগ্রসর হয়েছিল। পরিবারের পুরুষদের হত্যা, মহিলাদের ধর্ষণ এবং গণ ধর্মান্তরণ। যাঁরা ছিলেন হিন্দুদের নেতৃস্থানীয় তাঁদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়। যেমন জমিদার সুরেন্দ্রনাথ বসু যিনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আইনজীবী রাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরী ছিলেন জেলা হিন্দু মহাসভার সভাপতি।

মহিলাদের ওপর অত্যাচারের ভয়াবহ বিবরণ সভ্য সমাজকেই বাকরুদ্ধ করে দিয়েছিল। নোয়াখালি গণহত্যার পর উপদ্রুত অঞ্চলে সফর করেন কংগ্রেস নেত্রী সুচেতা কৃপালনী। তাঁর অভিজ্ঞতাতেও হিন্দু নারীদের ওপর ভয়াবহ নির্যাতনের চিত্র ফুটে ওঠে। লিগের দুষ্কৃতীরা আরও একটা পন্থা নিয়েছিল। জেলার সমস্ত হিন্দুকে ধর্মান্তর করে নোয়াখালিকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করতে চেয়েছিল লিগ নেতৃত্ব। নোয়াখালির গণহত্যা চলেছিল অন্তত ১০ দিন ধরে। ঠিক কতজন হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছিল, কতজন মহিলার সম্ভ্রমহানি হয়েছিল, কতজন মানুষকে ধর্ম পরিবর্তনে বাধ্য করা হয়েছিল তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। সরকার ২৮০ জনের বেশি মৃত্যুর খবর স্বীকার করেনি। সেই সময়কার অধিকাংশ সংবাদপত্র মত প্রকাশ করেছিল যে প্রায় ৫০০০-এর মতো মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। ধর্ষিতা নারীর সংখ্যা এবং জবরদস্তি ধর্মান্তরণের সঠিক সংখ্যা নিয়েও দ্বিমত আছে। নোয়াখালির পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী কুমিল্লা অঞ্চলেও হিন্দুদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চলে। উপদ্রুত হয় চাঁদপুর, চৌদ্দগ্রাম, ফরিদগঞ্জ, লাকসাম, হাজিগঞ্জ প্রভৃতি এলাকা।

আক্রান্ত মানুষের পাশে শ্যামাপ্রসাদ : নোয়াখালি ও টিপ্পেরা (ত্রিপুরা)-কুমিল্লার গণহত্যার খবর প্রাণপণ চেপে রাখার চেষ্টা করেছিল লিগ সরকার। কিন্তু চাঁদপুর রিলিফ কমিটির সেক্রেটারি ব্রজেন চক্রবর্তী পুরো ঘটনার খবর জানিয়ে শ্যামাপ্রসাদকে একটি টেলিগ্রাম করেন। শ্যামাপ্রসাদ এই খবর জানিয়ে একটি টেলিগ্রাম করেন শরৎ বসুকে। নোয়াখালি ও কুমিল্লা কাণ্ডের পর শ্যামাপ্রসাদের লক্ষ্য ছিল একদিকে দুর্গত মানুষের ত্রাণের চেষ্টা করা অন্যদিকে বহির্জগৎকে ঘটনার ভয়াবহতা জানানো এবং এই ঘটনার জন্য যে সুরাবর্দির নেতৃত্বাধীন লিগ সরকার দায়ী সেটা প্রমাণ করা এবং এর জন্য লিগ সরকারকে দায়বদ্ধ করা।

QUIT NOAKHALI OR DIE, GANDHI WARNS HINDUS

NEW DELHI, India, April 7 (AP) —Mohandas K. Gandhi, who has been attempting to insure communal peace in the Bengal and Bihar areas, said today religious strife in the troubled Noakhali section of Bengal seemed to call for Hindus to leave or perish "in the flames of fanaticism."

Meanwhile, a one-day strike of workers throughout Bombay Province appeared likely to be called by the Provincial Trade Union Congress to express sympathy with the two-week-old strike of 8,500 transport workers in the city of Bombay.

Mr. Gandhi halted his walking tour of Bengal and Bihar at the invitation of the new Viceroy, Viscount Mountbatten, for discussions on departure of the British from India by June, 1948. Today he released telegrams from Congress party workers in Noakhali, which is predominately Moslem, in which they described attempts to burn Hindus alive.

The New York Times
Published: April 8, 1947
Copyright © The New York Times

শ্যামাপ্রসাদ ও কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট আচার্য কৃপালনী কিছু স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে উপদ্রুত এলাকায় যান মানুষের পাশে দাঁড়াতে। শ্যামাপ্রসাদের অভিযোগ ছিল লিগ সরকার সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে সেরকম আগাম খবর থাকা সত্ত্বেও মানুষের জীবন রক্ষায় কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। নোয়াখালি ও কুমিল্লায় যা ঘটেছিল তা হলো পরিকল্পনা মাফিক হত্যা এবং ধর্মান্তরণ। লিগ আসলে ভবিষ্যৎ পাকিস্তানের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছিল।

শ্যামাপ্রসাদের ভাবনায় কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জায়গা পেয়েছিল। অজস্র হিন্দু রমণী ধর্ষিতা হয়েছিলেন, তাঁদের ধর্মান্তর করে সমাজ বিরোধী দুষ্কৃতীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। তাদের উদ্ধার করা এবং সমাজের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা ছিল সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। যে মানুষগুলো নিহত হয়নি তাদের গণহারে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল। তাদের দিয়ে জোর করে লিখিয়ে নেওয়া হয়েছিল যে তারা স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হয়েছে, তাদের কড়া নজরদারিতে রাখা হয় যাতে তারা চোখের আড়ালে গিয়ে সবাইকে আসল সত্যটা না বলে দেয়। আর নোয়াখালি ও কুমিল্লা গণহত্যার পর হাজার হাজার আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে যায়। তাদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনও ছিল আর একটি চ্যালেঞ্জ।

উপদ্রুত এলাকা সফর করে শ্যামাপ্রসাদ যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তার মধ্যে সমস্যার চরিত্র বিশ্লেষণ এবং সমাধানের ভাবনা নিহিত ছিল :

'নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় উপদ্রুত অঞ্চলের ঘটনাবলীর মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যাহা ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ইতিহাসে অভূতপূর্ব। অবশ্য ইহাকে কোনোক্রমেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলা চলে না। ইহা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্ঘবদ্ধ ও সুপরিকল্পিত আক্রমণ। এই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরণ ও লুণ্ঠন, গৃহদাহ এবং সমস্ত বিগ্রহ ও দেবমন্দির অপবিত্রকরণ। কোনো শ্রেণীর লোককেই রেহাই দেওয়া হয় নাই। যাহারা অপেক্ষাকৃত ধনী তাহাদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের মাত্রা আরও কঠোর হয়। হত্যাকাণ্ডও পরিকল্পনার অঙ্গ ছিল; কিন্তু যাঁহারা অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং যাঁহারা প্রতিরোধ করেন, প্রধানত তাঁহাদের জন্যই এই ব্যবস্থা ছিল। নারীহরণ, ধর্ষণ এবং বলপূর্বক বিবাহও এই সকল কুকার্যের অঙ্গ ছিল। কিন্তু এই প্রকার নারীর সংখ্যা কত তাহা সহজে স্থির করা সম্ভব নহে। যে সকল ধ্বনি উচ্চারিত হইয়াছিল এবং যে সকল কার্যপদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছিল তাহাতে দেখা যায় যে, এ সমস্তই সমূলে হিন্দুলোপ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার একটি পরিকল্পনার অঙ্গ ছিল। মুসলিম লিগের জন্য এবং ধর্মান্তরণ অনুষ্ঠানের ব্যয় ইত্যাদি অন্যান্য কারণে চাঁদা চাওয়া হইয়াছিল। ইহা হইতে দেখা যায় যে, আক্রমণকারীরা ও তাহাদের দলপতিরা মুসলিম লিগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিল। তাহা ছাড়া তাহারা আরও জানিত যে, প্রদেশে তাহাদের নিজেদের গভর্নমেন্ট রহিয়াছে এবং তাহাদের স্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত স্থানীয় রাজকর্মচারীরাও সাধারণত তাহাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। এই প্রকার ধারণার বশবর্তী হইয়া কুকার্যে তাহাদের সাহস আরও বাড়িয়া যায়।'

'সহস্র সহস্র লোক বিপজ্জনক এলাকার অন্তস্থল হইতে পলাইয়া গিয়া অত্যাচারীদের নাগালের ঠিক বাহিরে জেলার ভিতরেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। যে সকল স্থান এখনো উপদ্রুত হয় নাই, সেই সকল স্থান হইতেও অধিবাসীরা হাজারে হাজারে পলাইয়া আসিয়া আশ্রয় কেন্দ্রগুলিতে আশ্রয় লইয়াছে। কুমিল্লা, চাঁদপুর আগরতলা ইত্যাদি স্থানে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। সর্বশ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষ শিশু-সহ এই সকল আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রিতের সংখ্যা ৫০ হাজার হইতে ৭৫ হাজার হইবে।'

'এই সকল লোক ছাড়া আরও প্রায় ৫০ হাজার বা ততোধিক লোক এখনও বিপজ্জনক এলাকায় রহিয়াছে। এই এলাকায় অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে একদিনও বিলম্ব না করিয়া উদ্ধার করিতে হইবে। তাহাদের সকলকেই ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে এবং তাহারা এখনও অত্যাচারীদের হাতের মুঠোর ভিতর। তাহারা এখন নামেমাত্র মানুষ। তাহাদের অধিকাংশই সর্বস্বান্ত এবং তাহাদের শরীর, মন দুই-ই ভাঙিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের মধ্যে তফশিলি বা অন্যান্য শ্রেণী নির্বিশেষে সমস্ত শ্রেণীর হিন্দু আছে। তাহাদের উপর যে অপমান ও নির্যাতন চলিয়াছে তাহার সীমা নাই। তাহাদের নাম পরিবর্তন করা হইয়াছে তাহাদের স্ত্রীলোকেরা অপমানিত হইতেছে, তাহাদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের মুসলমানের মতো পোশাক পরিতে, আহার করিতে ও জীবনযাপন করিতে বাধ্য করা হইতেছে...'।

'আমাদের সহস্র সহস্র ভ্রাতা-ভগিনী এইভাবে নতিস্বীকারে বাধ্য হইয়া হিন্দু সমাজের গণ্ডির বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া আমি মনে করিতে পারি না। তাঁহারা হিন্দু ছিলেন, তাঁহারা এখনও হিন্দু এবং তাঁহারা আমরণ হিন্দু থাকিবেন। আমি প্রত্যেককে বলিয়াছি, হিন্দুসমাজে ফিরিয়া আসিতে হইলে তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে— কোনো ব্যক্তিই এরূপ কোনো কথা তুলিতে পারিবেন না। এই নির্দেশের বহুল প্রচার করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্তের কথা উঠিতেই পারিবে না। উদ্ধার করা হইবে, বলপূর্বক তাঁহাকে বিবাহ করা দুর্জনেও তিনি বিনা বাধায় স্বীয় পরিবারে ফিরিয়া যাইবেন। যে সকল কুমারী উদ্ধার হইবে, যতদূর সম্ভব তাহাদিগকে বিবাহ দিতে হইবে। যদি হিন্দু সমাজও দূরদৃষ্টির সহিত বর্তমান বিপদ উত্তীর্ণ না হইতে পারে, তবে ইহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন।'

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘ বিবৃতির অল্প কিছু অংশ এখানে উল্লিখিত হয়েছে, নোয়াখালি ও কুমিল্লার গণহত্যার পর দুর্গত মানুষের ত্রাণ এবং পুনর্বাসনে এক মানবিক এবং সমাজ সংস্কারমূলক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। রাজনীতিবিদ শ্যামাপ্রসাদের পাশাপাশি মানবিক এবং সমাজ-সংস্কারক এক আধুনিকমনস্ক শ্যামাপ্রসাদকেও দেখি এক নতুন ভূমিকায়।

তথ্যসূত্র :

১. Dr. Dinesh Chandra Sinha, Ashok Dasgupta, Asish Choudhury— 1946— The Great Calcutta Killings and Noakhali Genocide : A Historical Study.

২. Dr. N.K. Adak— Syama Prasad Mookerji : A Study of His Role In Bengal Politics (1929— 1953).

৩. শ্যামাপ্রসাদ, বঙ্গবিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ— ড. দীনেশ চন্দ্র সিংহ।

বঙ্গীয় ঘরানার এক দূরদর্শী ভারতীয় রাষ্ট্রনেতা ড. শ্যামাপ্রসাদ

বিনয়ভূষণ দাশ

বাঙ্গলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্যামাপ্রসাদ তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন শিক্ষাবিদ হিসেবে। মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনিষ্ঠতম উপাচার্য হিসেবে নিযুক্ত হন। উপাচার্য হিসেবে তাঁর গৌরবময় জীবনের শেষে, মূলত সেই সময়ের বাঙ্গলার রাজনৈতিক অবস্থাবৈগুণ্যে তিনি অনেকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজনীতিতে আসতে বাধ্য হন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি বঙ্গীয় বিধান পরিষদে নির্বাচিত হন। এর আগে তাঁর রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি কোনো যোগাযোগ ছিল না। তিনি মূলত শিক্ষাজগতের মানুষ ছিলেন কিন্তু তৎকালীন বাঙ্গলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁকে রাজনীতির আঙ্গিনায় টেনে আনে। তিনি তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন, 'My tendencies lay in the sphere of education administration and I did not feel attracted by the noisy and dusty career of a politician.'

১৯৩০ সালে তিনি বিধান পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের স্বার্থে তিনি পরের বছরে ওই নির্বাচনক্ষেত্র থেকেই নির্দল প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়ে আসেন। তিনি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দের কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে এবং বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকরের বাগ্মিতায় এবং তাঁর আদর্শের টানে ১৯৩৯ সালে অখিল ভারত হিন্দু মহাসভায় যোগদান করেন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার সভাপতি এবং নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সভাপতি নির্বাচিত হন। এইভাবে তিনি সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে যে বিষয়গুলির প্রতি দেশের সরকারকে বিশেষ ভাবে নজর দিতে হবে তা তিনি সেই সময়ই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ জয়ের পরে যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মের কাছে উপদেশ চেয়েছিলেন যুদ্ধজয়ের পরে তার কী কর্তব্য। পিতামহ ভীষ্ম তাঁকে বলেছিলেন, 'ধর্মরাজ, তুমি যুদ্ধজয়ের ফলে বাইরের শত্রুবিনাশ করেছ, এবারে তোমার যুদ্ধ তোমার নিজের সঙ্গে। নিজের দোষত্রুটিগুলি দূর করে তোমাকে আদর্শ রাজা হতে হবে।' ড. শ্যামাপ্রসাদও অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, ইংরেজদের থেকে আমরা স্বাধীনতা অর্জনের পরে আমাদের দেশের ভেতরের দোষত্রুটিগুলি দূর করতে হবে, তাকে শিক্ষায়, শিল্পে, মানবসম্পদ উন্নয়নে যত্নবান হতে হবে। দেশের ভিতরে বিচ্ছেদকামী শক্তিগুলিকে পরাজিত করে এক উন্নত ভারত গড়তে হবে।

সে কাজ তিনি শুরু করে দিয়েছিলেন তাঁর কর্মস্থল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই। সেখানে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন স্তরে পঠনপাঠন এবং পরীক্ষা দেওয়ার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা বাংলা চালু করেন। সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন ডাঃ হাসান সোহরাওয়ার্দি। তখনও অবধি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসবে ইংরেজি ভাষায় দীক্ষান্ত ভাষণ দেওয়ার রীতি চালু ছিল। তিনি উপাচার্য থাকার সময়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে দীক্ষান্ত ভাষণ দেবার আমন্ত্রণ করে তাকে বাংলায় সেই ভাষণ দিতে অনুরোধ জানান এবং সেইমতো রবীন্দ্রনাথ সেই প্রথম বাংলায় দীক্ষান্ত ভাষণদান করেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলায় সেই দীক্ষান্ত ভাষণদান করেন ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে। এক নতুন ইতিহাসের সাক্ষী হয় বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও তিনি মাতৃভাষার প্রসারকল্পে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি এবং ফজলুল হক বাঙ্গলার মুসলমানদের মধ্যে উর্দু প্রচারের বিরোধিতা করে বেঙ্গলি প্রোটেকশন লিগ স্থাপন করে উর্দু প্রসার প্রতিহত করেন।

Ganpati Sugar Industries Limited

Head Office
20B, Abdul Hamid Street
4th Floor, Kolkata - 700 069
Phone : 033-22483203
Fax : 033-22483195

Administrative Office
8-2-438/5, Road No. 4
BANJARA HILLS
Hyderabad - 500 034
040-2335215/213

Works
Village - Fasalwadi
Mandal Sangareddy
District - Medek
Andhra Pradesh

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের 'ভারত শাসন আইন' অনুসারে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে সীমিত ভোটদানের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই নির্বাচনে কংগ্রেস সর্বাধিক আসন, ৬০টি আসন লাভ করে। তারপর মুসলিম লিগ ও কৃষক প্রজা পার্টি যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে। কৃষক প্রজা পার্টির নেতা আবুল কাশেম ফজলুল হক কংগ্রেস পার্টির বঙ্গীয় আইনসভার সংসদীয় নেতা কিরণশঙ্কর রায়, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, কংগ্রেস নেতা অতুল্য ঘোষ প্রভৃতি নেতারা আহ্বান জানান তাঁর নেতৃত্বে একটি জোট মন্ত্রীসভা গঠনের আবেদনে সাড়া দিতে। বঙ্গীয় কংগ্রেস নেতারা রাজি থাকলেও কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃগণ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইত্যাদি নেতাদের আপত্তিতে বঙ্গীয় কংগ্রেস জোট সরকার গঠনে রাজি হতে পারল না। সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধী, আজাদ ইত্যাদি নেতাদের এই আচরণের বিরোধিতা করেন। ফলে শেষ অবধি এ কে ফজলুল হক মুসলিম লিগের খপ্পরে পড়ে মুসলিম লিগের সঙ্গে জোট মন্ত্রিসভা গঠন করতে বাধ্য হন। ড. শ্যামাপ্রসাদ তখনও শিক্ষাক্ষেত্রেই উপাচার্য হিসেবে ব্যস্ত আছেন। মুসলিম লিগ পদে পদে হক সাহেবের কাজের বিরোধিতা করতে লাগল।

ফজলুল হক মুসলিম লিগের অসহযোগী মনোভাবে ক্ষুব্ধ, বিরক্তবোধ করতে লাগলেন। ১৯৪১-এ মুসলিম লিগের এই অসহযোগিতা চরম আকার ধারণ করল। তাঁরা জোট মন্ত্রিসভা থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিল। এ কে ফজলুল হক এই ধরনের একটা অবস্থা যে হতে পারে তা আগেই অনুমান করেছিলেন। ফলে তিনি আগেই ফরোয়ার্ড ব্লক, কিছু তফশিলিভুক্ত নির্দল হিন্দু এবং ড. শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে আগেই কথা বলে রেখেছিলেন। ড. শ্যামাপ্রসাদ হক সাহেবকে লিগের কবল থেকে ছাড়িয়ে আনতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি এবং ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা, সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু জোট মন্ত্রীসভা গঠনে রাজি হলেন। স্থির হলো, হক সাহেব হবেন মুখ্যমন্ত্রী, শরৎ বসু হবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হবেন অর্থমন্ত্রী। শ্যামাপ্রসাদ বুঝতে পেরেছিলেন, মুসলিম লিগকে যে কোনো ভাবে প্রতিহত করতে হবে এবং বাংলাকে মুসলিম লিগের সাম্প্রদায়িক, বিভেদকামী রাজনীতি থেকে মুক্ত করতে হবে এবং হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির উপর ভিত্তি করে মন্ত্রীসভা গঠন করতে হবে।

এই লক্ষ্য নিয়েই তিনি হকের সঙ্গে যৌথ মন্ত্রীসভা গঠনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১৯৪১ সালের ২৭ নভেম্বর কংগ্রেস নেতা জে সি গুপ্তের কলকাতার বাসভবনে শরৎচন্দ্র বসু, হেমচন্দ্র নস্কর, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, খান বাহাদুর হাশেম আলি খান, শামসুদ্দিন আহমেদ ইত্যাদি ফরোয়ার্ড ব্লক, হিন্দু মহাসভা, কৃষক প্রজা পার্টি, হিন্দু ও মুসলমান নির্দল সদস্যরা প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা যা 'শ্যামা-হক' নামে পরিচিত সেই মন্ত্রীসভা গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু মন্ত্রীসভা গঠনের আগেই শরৎচন্দ্র বসুকে ইংরেজ সরকার গ্রেপ্তার করায় তিনি মন্ত্রীসভায় যোগ দিতে পারেননি, তবে তাঁর ফরোয়ার্ড ব্লকের কয়েকজন মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন। এই মন্ত্রীসভা ১৯৪১ সালের ১২ ডিসেম্বর শপথ গ্রহণ করে। ফজলুল হক ও ড. শ্যামাপ্রসাদ হাতে হাত ধরে সমগ্র বাঙ্গলায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি রক্ষায় প্রচার করেছেন। যতদিন বাঙ্গলায় 'শ্যামা-হক' মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় আসীন ছিল ততদিন বাঙ্গলার কোথাও একটিও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা সংঘর্ষ হয়নি। এ অবধি 'শ্যামা-হক' মন্ত্রীসভাই একমাত্রও মন্ত্রীসভা যারা হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি রক্ষায় সত্যিকারের কাজ করেছে। বাঙ্গলায় এই মন্ত্রীসভা স্থায়ী হলে পরবর্তীকালে হয়তো মুসলিম লিগ শক্তিশালী হতো না এবং বাঙ্গলার দুর্ভাগ্যজনক বিভাজন হতো না।

কেন্দ্রীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের ষড়যন্ত্রে যখন দেশবিভাগ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল একমাত্রও তখনই তিনি হিন্দুদের জন্য বঙ্গভাগ চেয়েছিলেন এবং তা ভারতের মধ্যেই। কিন্তু লিগ ও কংগ্রেস যখন ক্ষমতার প্রতি উদগ্র মোহে, হিন্দু-মুসলমান ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ করল, তখন দুই দেশের সংখ্যালঘুরা নিজেদের নিরাপত্তা ও জানমালের সুরক্ষায় দেশত্যাগ করতে লাগল, উদ্বাস্তু হতে লাগল, তখন ভারতে, বিশেষ করে পঞ্জাব ও বাঙ্গলায় ব্যাপক উদ্বাস্তু সমস্যার সৃষ্টি হলো। ড. শ্যামাপ্রসাদ তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে অনুভব করলেন, ভবিষ্যতে এই উদ্বাস্তু সমস্যা এক বিরাট আকার ধারণ করবে। দেশভাগ ও বঙ্গভাগের পরে তাঁর সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিল উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে লক্ষ লক্ষ অসহায়, নিঃসম্বল হিন্দু ও বৌদ্ধ উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে তীব্র ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়তে লাগল। ১৯৪৬-১৯৫১ এই কালপর্বে তাঁকে দেখা গেল এক মানবতাবাদী, হিন্দু উদ্বাস্তুপ্রেমিক সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায়। ড. শ্যামাপ্রসাদ সরকারের বৈষম্যমূলক উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন নীতির তীব্র প্রতিবাদ করলেন। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত হিন্দু উদ্বাস্তুদের তিনি 'বহিরাগত' তকমা দিলেন না। তাঁদের জন্য ভারতের স্থায়ী নাগরিকত্ব দাবি করলেন, কারণ দেশভাগের জন্য তাঁরা দায়ী নন।

পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টিতে তিনি যেমন বাঙ্গলার সমস্ত প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবীর সাহায্য ও সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছিলেন তেমনই এক্ষেত্রেও তিনি বাঙ্গলার অগ্রণী বুদ্ধিজীবীদের সক্রিয় সমর্থন পেলেন। ড. মেঘনাদ সাহা, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, স্যার যদুনাথ সরকার প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীদের সক্রিয় সমর্থন পেলেন। সেই সময়ে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে স্যার যদুনাথ সরকারের সভাপতিত্বে পূর্ববঙ্গের হিন্দু উদ্বাস্তুদের সমর্থনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের প্রস্তাবক্রমে আমেরিকার টেনিসি ভ্যালি সংস্থার মতো উদ্বাস্তুদের উন্নয়নকল্পে একটি স্থায়ী সমিতি গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলি ভারতে নিয়ে আসার জন্যও ড. সাহা ও মজুমদার সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন। আর ড. শ্যামাপ্রসাদ ১৯৪৬-১৯৫১ এই কালপর্বে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করেন উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসনে। একথা বলা প্রাসঙ্গিক যে, উদ্বাস্তু ত্রাণ, পুনর্বাসন এবং তাঁদের এ দেশের নাগরিকতাদান যে ভবিষ্যতে এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে দেখা দেবে তা তিনি তখনই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী তিনি কাজ শুরু করেছিলেন। অন্য নেতাদের কিন্তু এই দূরদর্শিতা দেখা যায়নি। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য

যে, তাঁরই প্রতিষ্ঠিত জনসঙ্ঘের উত্তরসূরি, ভারতীয় জনতা পার্টির বর্তমান সরকার হিন্দু উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেবার জন্য আইন প্রণয়ন করেছে এবং তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়া শুরু হয়েছে।

স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রীসভায় তিনি যোগ দিয়েছিলেন আরও চারজন অকংগ্রেসি নেতার মতোই। স্বাভাবিকভাবেই সচেতন নাগরিকেরা আশা করেছিলেন, ড. শ্যামাপ্রসাদ শিক্ষামন্ত্রী হবেন, কারণ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে শিক্ষাজগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রাজনীতিতে যোগদানের আগে। আরও একজন উচ্চশিক্ষিত মন্ত্রী, ড. বি আর আম্বেদকরও ছিলেন সেই মন্ত্রীসভায়। কিন্তু তথাকথিত আধুনিক মানসিকতার পূজারি জওহরলাল নেহরু কিন্তু তাঁদের কাউকে শিক্ষামন্ত্রী করলেন না, তিনি শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব দিলেন কোনো আধুনিক শিক্ষা না থাকা, মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে। এও এক পরিহাস। যাইহোক, ড. শ্যামাপ্রসাদ পেলেন শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রকের দায়িত্ব। তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই ছিল, যে দায়িত্বই তিনি পেতেন তাই নিষ্ঠাভরে পালন করতেন। শিল্প ও সরবরাহমন্ত্রকে এসে তিনি অনুভব করলেন, শিক্ষার চেয়ে কোনো অংশে কম নয় শিল্পমন্ত্রক, স্বাধীন দেশের সার্বিক উন্নতিতে শিল্পের গুরুত্ব সমধিক। শিল্প ও বাণিজ্যই একটা দেশকে উন্নতির সোপানে পৌঁছে দিতে পারে।

সুতরাং তিনি দেশের বিভিন্নস্থানে আধুনিক শিল্প স্থাপনে মনোনিবেশ করলেন। তিনি কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও সরবরাহমন্ত্রকে ছিলেন দুই বছর সাত মাস, ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট থেকে ৮ এপ্রিল ১৯৫০। তাঁরই মন্ত্রিত্বের সময়ে ভারতে শিল্পায়ন শুরু হয়। তাঁর উদ্যোগে ভারতে বেশ কয়েকটি ভারী শিল্প স্থাপিত হয়। তিনি কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, বিমান উৎপাদন কারখানা, জাহাজ তৈরির কারখানা, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি উৎপাদন এবং খনিজ তেল উৎপাদনকে বিশেষ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্প হিসেবে ঘোষণা করেন। তাঁর উদ্যোগেই ব্যাঙ্গালোরে হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাফট লিমিটেড, চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কশপ, সিন্ধ্রি ফারটিলাইজার ফ্যাক্টরি, দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানা ইত্যাদি স্থাপিত হয়। দামোদর উপত্যকায় নদীবাঁধ প্রকল্প রূপায়ণের জন্য তিনি আমেরিকার টেনেসি ভ্যালি প্রকল্পের রূপায়ণকারী ড. ভুরুডুইনকে ভারতে এনেছিলেন। পাঞ্চেত জলাধার প্রকল্প, চণ্ডীগড়ের ভাকরা-নাঙ্গাল প্রকল্প তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা এবং তার সামাজিক প্রয়োগ তাঁর মন্ত্রিত্বে অগ্রাধিকার পেয়েছিল।

তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ ছাড়া শিল্পে অগ্রগতি সম্ভব নয়, তাই তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে উন্নয়নের মেলবন্ধন ঘটাতে সচেষ্ট ছিলেন। ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি, কলকাতার সাহা ইন্সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ভিজিক্স, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স, সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সেরামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট, এগ্রিকালচারাল ইন্সটিটিউট, খড়্গপুরের আইআইটি ইত্যাদির সঙ্গে তিনি কোনো না কোনোভাবে জড়িত ছিলেন।

এরপরে আসে তাঁর কাশ্মীর সত্যাগ্রহের কথা। জম্মু ও কাশ্মীরের সম্পূর্ণ ভারতভুক্তি যে ভারতের ঐক্য ও সংহতি, নিরাপত্তা, জম্মুর নাগরিকদের অধিকার রক্ষার জন্য বিশেষ জরুরি। আর এসবেরই অন্তরায় হলো ওই রাজ্যের জন্য ৩৭০ ও ৩৫-এ ধারা। এই ধারা দুটির অবলুপ্তিই জম্মু ও কাশ্মীরের সম্পূর্ণ ভারতভুক্তির প্রাক্‌শর্ত। আর এই ধারাদুটির অবলুপ্তি এবং ওই রাজ্যের সম্পূর্ণ ভারতভুক্তির জন্য আন্দোলন করে জম্মু ও কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লার কারাগারে তাঁকে রহস্যজনক মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল।

জম্মু সত্যাগ্রহের আগেই অবশ্য তিনি ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অখিল ভারতীয় জনসঙ্ঘ। ভারতীয় আদর্শ, ভারতীয় অস্মিতাবোধ, ভারতীয় সংস্কৃতিবোধের উপর ভিত্তি করে তিনি এই দল স্থাপন করেছিলেন। এই দলটিই আজ ভারতের কেন্দ্রীয় এবং সহযোগীদের নিয়ে বেশিরভাগ রাজ্যে ক্ষমতায় আসীন। তাঁর আদর্শের এবং চিন্তা ভাবনার উপর ভিত্তি করে দলটি কাজ করে চলেছে।

উপরে প্রদত্ত তাঁর কাজকর্মের থেকে বোঝা যায়, তৎকালীন অন্যান্য বাঙ্গালি রাজনৈতিক নেতার থেকে তিনি অনেক এগিয়ে চিন্তাভাবনা করতেন। একটা সদ্য স্বাধীন দেশকে পুনর্গঠিত করতে গেলে যে ধরনের দূরদর্শী চিন্তানায়ক হতে হয় তিনি তেমনই চিন্তানায়ক ছিলেন। অনেক বাঙ্গালি নেতাই তাঁদের আদর্শ, চিন্তাভাবনার ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বরাজ্য পার্টি, এ কে ফজলুল হক তৈরি করেছিলেন কৃষক প্রজা পার্টি, সুভাষচন্দ্র বসু স্থাপন করেছিলেন ফরোয়ার্ড ব্লক; কিন্তু কালের নিয়মে ওই পার্টিগুলি আজ অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে। তাঁদের আদর্শের ধারক ও বাহক দলগুলি আজকের ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। অথচ, আজকের ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক।

ড. শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে ভারতের দুজন বিখ্যাত রাজনীতিক ও সাংবাদিকের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেওয়া এখানে খুব প্রাসঙ্গিক হবে। বিখ্যাত বাঙ্গালি সাংবাদিক শঙ্কর ঘোষ তাঁর 'হস্তান্তর' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থে লিখেছেন, 'সেদিনের আলোচনায় অংশগ্রহণকারী তিনজনই (দুই সাংবাদিক ইন্দর মালহোত্রা, শৈলেন চট্টোপাধ্যায় এবং সিপিএম সাংসদ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়) একমত হন যে লোকসভায় স্বাধীনতা পরবর্তীকালের শ্রেষ্ঠবক্তার সম্মান শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রাপ্য। সংসদীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দক্ষতায় শ্যামাপ্রসাদ নেহরুকে ছাড়িয়ে যেতেন।' বিখ্যাত সাংবাদিক দুর্গাদাস তাঁর বিখ্যাত পুস্তক India from Curzon to Nehru and After গ্রন্থে লিখেছেন, 'There were only three effective spokesmen of the Opposition during the Nehru era. They were S.P. Mookerjee, Kripalani and Lohia. The first was a real leader because he spoke for the largest group which opposed Nehru's policies. In oratory and debating skil, he excelled all others who have followed him. বাঙ্গালির আইকন আজ সমগ্র ভারতের আইকন।

‘রক্তাক্ত বাংলা, নয় দিনে ছয় জন খুন’। ‘মনোনয়নের পর স্ক্রুটিনি পর্বেও বেলাগাম সন্ত্রাস, ঝরলো প্রাণ’। ‘মালদহে সুজাপুরের টিএমসি নেতা মুস্তাফা শেখকে পিটিয়ে খুন করল জনতা’। ‘নিশীথ প্রামাণিকের গাড়ি লক্ষ্য করে তির ছোড়ার অভিযোগ’। ‘কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সামনেই বিজেপি কর্মীদের মার’। ‘বিডিয়ো অফিসে অনুপ্রবেশের অভিযোগে এফআইআর ভাঙড় টু ব্লকের বিডিয়োর’। ‘বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের বিজেপি প্রার্থীর’। ‘৪০ জন বিজেপি প্রার্থী ও কর্মীকে মারধর করা

শুধু কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে এরাজ্যে সুষ্ঠু নির্বাচন অসম্ভব

সাধন কুমার পাল

গত ১৭ জুন একটি বাংলা টেলিভিশন চ্যানেলে রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচন সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন দেখছিলাম। প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু ছিল গত ১৬ জুন নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিযুক্তি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায় এবং সেই রায়ের উপর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির প্রতিক্রিয়া। মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শোনা যাচ্ছিল যে এত শান্তিপূর্ণ মনোনয়ন ইতিপূর্বে এ রাজ্যে কখনো হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া শুনে মনে হচ্ছিল তিনি হয়তো কোনো পাহাড়ের কোণে কোনো মেডিটেশন ক্যাম্পে চলে গিয়েছিলেন অথবা অন্য কোনো গ্রহেও গিয়ে থাকতে পারেন যেখান থেকে এই রাজ্যের অর্থাৎ মর্ত্যলোকের সঙ্গে কোনোভাবেই যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না। আমরা সাধারণ মানুষ চোখের সামনে হিংসা দেখতে পাচ্ছি, হাইকোর্ট হিংসা দেখতে পাচ্ছে টিভি চ্যানেলে। টিভি চ্যানেল খুললে মনে হচ্ছিল যুদ্ধ ইউক্রেনে নয়, পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছে। টিভির পর্দার নীচে যে স্ক্রলগুলো যাচ্ছে তাতে হিংসার কথা বলা আছে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হিংসা দেখতে পাচ্ছেন না।

আমার এই লেখা প্রামাণিক তথ্য ভিত্তিক করার জন্য সেই প্রতিবেদন চলাকালীন টিভি পর্দার নীচে যে স্ক্রলগুলো চলছিল আমি তার কয়েকটি নথিভুক্ত করলাম। যেমন, ‘পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পর্বে লাগামহীন সন্ত্রাস’। ‘খরগ্রাম ভাঙ্গর নবগ্রামের পর সুজাপুর’। হয়েছে, অভিযোগ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর’। ‘গণতন্ত্রের উৎসব ঘিরে পর পর খুন’। ‘মনোনয়নের মাশুল, হুমকিতে ঘরছাড়া, বিজেপি কর্মীরা’। ‘মনোনয়নের হিংসা শুরু হয়েছিল ডোমকলে কংগ্রেস কর্মীর মৃত্যু দিয়ে’। ‘জেলায় জেলায় বারুদ ঠাসা পাতালঘর। বেআব্রু নিরাপত্তা, কোথায় আইনশৃঙ্খলা। গ্রাম দখলের লড়াইয়ে রক্তাক্ত বাংলা’।

রাজ্যজুড়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে নির্বাচন করানোর জন্য হাইকোর্ট নির্দেশ দিলেও এবং সেই নির্দেশ পালনের অঙ্গীকার করেও অবশেষে রাজ্য নির্বাচন কমিশন সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলো। সঙ্গে রাজ্য সরকার। প্রশ্ন হচ্ছে, নমিনেশন পর্যায়ে নয় দিনের ছটি খুন হওয়ার পরও রাজ্য সরকার এবং নির্বাচন কমিশন কেন কেন্দ্রীয় বাহিনী চাইছেন না। তা কিন্তু দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। ক্ষমতাশীল তৃণমূলের একটা ক্ষুদ্র অংশ বাদে সবাই

চাইছেন অশান্তি এড়াতে কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রয়োজন।

মুখ্যমন্ত্রীর মনোভাব থেকে স্পষ্ট যে রাজ্যের মনোনয়ন পর্বের হিংসা, স্ক্রুটিনি পর্বের হিংসা এবং আসন্ন নির্বাচন পর্বে যে হিংসা সংঘটিত হবে সেগুলো কোনোটাই বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয় এবং সেগুলো পরিকল্পিত ঘটনা এবং তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রী স্বয়ং। স্বাভাবিকভাবেই এ রাজ্যের প্রশাসন নিরপেক্ষ হতে পারে না। সেজন্য শুধু কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগ করে এ রাজ্যে নিরপেক্ষ নির্বাচন করা সম্ভব নয়।

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি এ রাজ্যে বিডিয়ো থেকে ডিএম সবাই ভোট লুটের সঙ্গে যুক্ত থাকতে বাধ্য হয়। বিগত দিনেও আমরা দেখেছি নির্বাচনী পর্ব শুরু হয়ে গেলে মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি প্রকাশ্যেই নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত সবাইকে নির্বাচনের পরে দেখে নেওয়ার হুমকি দিতে থাকেন। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে মানুষ খেপিয়ে তোলার জন্য সর্বসমক্ষেই উসকানি দিতে থাকেন।

তৃণমূলের এমএলএ মদন মিত্রকে বলতে শোনা যাচ্ছে যে কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে কী করবে? ওরা বুথের বাইরে ডিউটি করবে আর বুথের ভেতরে তো আমরাই ভোট করাবো। সেই জন্য এ রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী গণতন্ত্র রক্ষার জন্য একমাত্র দাওয়াই এটা বলা যাবে না।

আসলে এখানে ব্যবস্থাটা এতটাই নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে তৃণমূল কংগ্রেস বা মমতা ব্যানার্জিকে ক্ষমতায় রেখে ভোট করানোর অর্থ হলো গণতন্ত্রকে একটা হাস্যকর উপাদানে পরিণত করা। এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রী যেভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে লোক খেপানোর কাজ করেন তা এক কথায় নজিরবিহীন। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ঘিরে ফেলার আহ্বান করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। পঞ্চায়েত নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রসঙ্গ আসতেই তিনি আবার সেই একই কাজ করতে শুরু করেছেন।

কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে কী করবে? ওরা বুথের বাইরে ডিউটি করবে আর বুথের ভেতরে তো আমরাই ভোট করাবো।
—মদন মিত্র, বিধায়ক, তৃণমূল কংগ্রেস

মনোনয়ন দাখিল পর্বের হিংসা প্রকাশ্যে আসে। সেই নিয়ে হইচই হয়। মনোনয়ন প্রত্যাহারের হুমকির খবরও সবগুলি না হলেও কিছুটা প্রকাশ্যে আসে। এরপর নির্বাচনের দিন বুথদখল, ভীতি প্রদর্শনের খবরও সবটা না হলেও অনেকটাই সামনে আসে। এগুলো দেখতে মানুষ অভ্যস্ত। ভোটকর্মী হিসেবে যারা যান তারা যে সবাই পক্ষপাতদুষ্ট তা নয়, তবে বুলেটের মুখে প্রাণের ভয়ে বেশিরভাগই ভোট লুটেরাদের কথামতো কাজ করতে বাধ্য হন। কথা না শুনলে তার পরিণতি যে রাজকুমার রায়ের মতো হবে এটা সবাই বোঝেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যারা নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকেন বুথের ভোটকর্মীরা যখন বিপদে পড়েন তখন তাদের ডাকলে পাওয়া যায় না, এটাই নির্বাচনের দিনের স্বাভাবিক চিত্র। বলা ভালো, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কেউ প্রতিরোধ করতে যান না। তাছাড়া অকারণে কেনই-বা ঝামেলায় জড়াবেন। কার জন্য জড়াবেন, নিজে ঝামেলায় পড়লে তার সুরাহা পেতে নিজেকেই লড়তে হবে। সেজন্য কোনোরকম ভোট করে বাড়ি ফেরাই থাকে ভোটকর্মীদের প্রধান উদ্দেশ্য।

এই সমস্ত বিষয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রে আলোচিত হয়েছে। সেজন্য এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে অনেকেরই কম-বেশি ধারণা আছে। কিন্তু গণনাকেন্দ্রের ভিতর তৈরি হওয়া ভয়াবহ চিত্র সম্পর্কে মানুষের ধরণা নেই বললেই চলে। নিরাপত্তার জন্য গণনাকেন্দ্রে প্রয়োজনের থেকে অনেক বেশি কড়াকড়ি থাকে। কার্যত খাঁচার ভিতরই ভোট গণনা চলে। সেই খাঁচার বাইরে থেকে রাজনৈতিক দলের এজেন্টরা সেই প্রক্রিয়া দেখতে পারেন বা হিসাব রাখতে পারেন। ভোটিং মেশিনে ভোট হলে সেক্ষেত্রে গরমিল হয় না তা বলা যাবে না। ভোটকর্মীদের গল্পগুজবে কান পাতলে এসব কথা হামেশাই শোনা যায় চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার জন্য তথ্য রিটার্নিং অফিসারের টেবিলে পৌঁছানোর পথেই অনেক ফলাফল পরিবর্তন হয়ে যায়। তাছাড়া আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি এই ঘটনার সত্যতা আছে। ব্যালট পেপারে ভোট হলে তো কথাই নেই। ক্ষমতাসীন দলের ব্যালট পেপারগুলোতে বাড়তি চাপ দিয়ে সেগুলোকে নষ্ট করে দেওয়া, সেগুলোকে বাতিল ভোটের প্যাকেটে ঢুকিয়ে দেওয়া তো জলভাত।

ভোটকর্মীদের ঘাড়ে ক'টা মাথা যে এগুলির প্রতিবাদ করবে। গণনার সময় যে ৫০-৫০ বা ১০০-১০০ ব্যালটের বান্ডিল করা হয় সেগুলি পর্যন্ত পরিবর্তন হয়ে যায়। সে অনেক রকম ভাবেই ফলাফল উলটপালট হয়। গণনার সঙ্গে যুক্ত সরকারি আধিকারিকরা এই সমস্ত বিষয়ে দেখেও দেখেন না। একাংশ হয়তো কিছু লোভে পড়ে করেন আর একাংশ প্রাণের ভয়ে এই সমস্ত দুর্নীতি করতে বাধ্য হন। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনেও গণনাকেন্দ্রে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে। গণনাকেন্দ্র থেকে বিরোধীদের ধমকে বের করে দিয়ে তারপর নিরাপদে সেই গণনাকে নয়ছয় করে দেওয়া এখন পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক ঘটনা।

সেজন্য সুষ্ঠু নির্বাচন করতে হলে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে মমতা ব্যানার্জির হুমকির হাত থেকে সরকারি কর্মচারী, ভোট কর্মীদের বাঁচানো দরকার। কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে কেউ উসকানিমূলক মন্তব্য করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনসম্মত ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিশেষ আইন অনুসারে জেলবন্দি করতে হবে। সেজন্য এ রাজ্যে গণতন্ত্র ফেরাতে হলে বিচার বিভাগ, কেন্দ্র সরকার, মিডিয়া এবং এ রাজ্যের সাধারণ মানুষকে আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে হিংসার রাজনীতি বন্ধ না হলে রাজ্যের ভবিষ্যৎ অন্ধকার

আনন্দ মোহন দাস

বর্তমান রাজ্য সরকার ও শাসকদলের নেতারা সাম্প্রতিককালে সর্বস্তরে আকণ্ঠ দুর্নীতির পাঁকে যে নিমজ্জিত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। নিত্যদিন আদালতের নির্দেশে আমলা ও নেতারা বিভিন্ন তদন্তের সম্মুখীন হয়ে জেল খাটছেন। বিভিন্ন দুর্নীতিতে আদালতের কড়া পর্যবেক্ষণে শাসকদল তথা রাজ্য সরকার অভিযুক্ত এবং বিব্রত। এ বিষয়ে জনগণের করের টাকায় বিপুল অর্থ খরচ করেও সমস্ত আদালতে সরকার ও দলের নেতাকর্মীদের সুরাহা মেলেনি। রাজ্যের মানুষ প্রতিনিয়ত এইসব সংবাদে যখন ক্লান্ত, ঠিক তখনই নতুন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা শাসকদলের আনুগত্যের যূপকাষ্ঠে নিজেকে বলি দিয়ে গত ৮ জুন আচমকা পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা করে দিলেন। এযাবৎকালের সমস্ত শিষ্টাচারকে বিসর্জন দিয়ে শাসকদলকে সুবিধা দিতে সর্বদলীয় বৈঠক না করেই নির্বাচন কমিশনার ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করে দিলেন এবং পরের দিন থেকেই নমিনেশন প্রক্রিয়া চালু করলেন। এমনকী নির্বাচন কমিশনার নিজের দায়িত্ব ঠিকমতো বুঝে ওঠার আগেই কোনো এক অদৃশ্য অঙ্গুলি হেলনে তড়িঘড়ি ভোট ঘোষণা করলেন। মনোনয়নের নামে প্রহসন সৃষ্টি করে নিরপেক্ষতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে অযোগ্যতা ও পক্ষপাতিত্বের নির্লজ্জ নিদর্শন রাখলেন। আরও অভিযোগ উঠেছে, পরবর্তীকালে উদ্ভূত পরিস্থিতি ও তাঁর কার্যকলাপ প্রমাণ করে তিনি এযাবৎকালের সবচেয়ে অপদার্থ ও অযোগ্য নির্বাচন কমিশনার। এমনকী তার নিয়োগকর্তা রাজ্যপাল তার জয়েনিং রিপোর্ট ফেরত পাঠিয়েছেন। সুতরাং তার নিযুক্তি এখন প্রশ্নের মুখে। ইতিমধ্যে বিরোধীরা তাঁকে শাসক তৃণমূলের দলদাস হিসেবে চিহ্নিত করে অবিলম্বে তার পদত্যাগ দাবি করেছে। পঞ্চায়েত ভোটের দামামা হয়তো বেজে গেছে ঠিকই কিন্তু আদৌ নির্ঘণ্ট অনুযায়ী নির্বাচন সম্পন্ন হবে কিনা, তা আজকের দিনে জোর দিয়ে বলা খুব কঠিন। নির্বাচন কমিশনারের আচার আচরণ ও তার ক্রিয়াকলাপই এর জন্য দায়ী বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন।

যাইহোক, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পর্কে রাজনৈতিক আলোচনার প্রারম্ভে পশ্চিমবঙ্গের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে কিছু তথ্য ও পরিসংখ্যান সামনে রাখা খুবই প্রাসঙ্গিক। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উৎপত্তি হলো পঞ্চ বা পাঁচ থেকে। একসময় পঞ্চায়েতে পাঁচজন সদস্য নিয়ে স্বশাসিত, স্বনির্ভর গ্রামীণ পরিষদ গঠিত হতো। সেই থেকে শুরু হলো পঞ্চায়েত শব্দের উৎপত্তি। গ্রামীণ স্তরে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হলো পঞ্চায়েত ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির মজবুতিকরণ এবং জনকল্যাণে স্থানীয় ভাবে স্বায়ত্তশাসন কায়েম করাও এর উদ্দেশ্য রয়েছে। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, ১৮৮৪ সালে বঙ্গীয় স্থানীয় স্ব-শাসন আইন অনুসারে প্রথম ত্রিস্তর জনপ্রতিনিধিমূলক পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯১৯ সালে বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইনের মাধ্যমে ইউনিয়ন বোর্ড গঠন হলেও, এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন ব্যাপারে স্থানীয় জনসাধারণের উদ্যোগ ও অংশগ্রহণের সুযোগ খুব সামান্যই ছিল। এমনকী স্থানীয় ব্যবস্থায় মহিলাদের অংশগ্রহণের কোনো প্রশ্নই ছিল না। স্বাধীনতার পরে ১৯৫৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ও ১৯৬৩ সালের জেলা পরিষদ আইনের আওতায় সমগ্র রাজ্যে চারস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রচলন হয়। অর্থাৎ (১) গ্রাম পঞ্চায়েত, (২) পঞ্চায়েত সমিতি, (৩) আঞ্চলিক পরিষদ ও (৪) জেলা পরিষদ, কিন্তু সত্তরের দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে কার্যকর গ্রামীণ স্থানীয় স্বশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। সেজন্য ১৯৭৩ সালে উপরিউক্ত দুটি আইনকে একত্রিত করে এবং কিছু নতুন বিধি সংযুক্ত করে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন (West Bengal Panchayat Act, 1973) প্রণীত হয়। কিন্তু ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পরও সেই আইন অনুসারে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কার্যকর করেনি। বরং বামপন্থীরা পঞ্চায়েতে দলীয় স্বার্থ কায়েম করতে ও দখলদারি বজায় রাখতে ১৯৭৮ সালে বেশ কয়েকটি সংশোধনী (১৯৭৩ পঞ্চায়েত আইন) এনে দল হিসেবে পঞ্চায়েত ভোটে লড়ার ব্যবস্থা করলেন। তখন থেকে এই রাজ্যে ত্রিস্তর ও রাজনৈতিক দল

ভিত্তিক স্থানীয় গ্রামীণ স্বশাসন বা পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হলো এবং সেই অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ও রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে চলেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এবারের নির্বাচনী নির্ঘণ্ট অনুযায়ী আগামী ৮ জুলাই পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং ১১ জুলাই নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা। এখানে পঞ্চায়েত ভোটের জন্য মোট ৬১৬৩৬টি পোলিং বুথ নির্ধারিত হয়েছে। আসন সংখ্যার বিচারে গ্রাম পঞ্চায়েতের আসন সংখ্যা ৬৩২২৯, পঞ্চয়েত সমিতির ৯৭৩০ এবং জেলা পরিষদের ৯২৮টি আসন রয়েছে।

বলাবাহুল্য, অনুগত নির্বাচন কমিশনারকে দিয়ে তড়িঘড়ি নির্বাচন ঘোষণা করিয়ে এবং বিরোধীদের সুযোগ না দিয়ে সন্ত্রাসের মাধ্যমে শাসকদলের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত দখল করার নগ্ন প্রয়াস শুরু হয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো নির্বাচন মানে যে হিংসা তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উত্তরপ্রদেশ, বিহার-সহ দেশের সব রাজ্যে যখন বিনা রক্তপাতে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়, পশ্চিমবঙ্গে তখন একমাত্র ব্যতিক্রমী রাজ্য। আজ থেকে ১৫/২০ বছর আগে বিহার, ইউপিতে নির্বাচনে হিংসা ছিল কিন্তু আজ তা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ। শাসকের সদিচ্ছা থাকলে সবকিছু যে সম্ভব তার প্রমাণ। কিন্তু বঙ্গবাসীর দুর্ভাগ্য আজও আমরা নির্বাচনী হিংসায় এক নম্বর স্থানে রয়েছি।

সুষ্ঠ গণতন্ত্রের অন্যতম মাপকাঠিই হলো শান্তিপূর্ণ নির্বাচন। গণতন্ত্রে হিংসা ও সন্ত্রাসের কোনো স্থান নেই। ভয় মুক্ত পরিবেশে জনগণ তাদের নিজ ভোটাধিকার প্রয়োগ করে নিজেদের প্রার্থী নির্বাচন করবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে হিংসাত্মক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। দুঃখের বিষয়, নির্বাচন ঘোষণার পর নমিনেশন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে আটদিনে নয়জন মানুষের প্রাণ চলে গেছে এবং বেশ কিছু মানুষ আহত অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। এবারের নির্বাচনের অভূতপূর্ব অভিযোগগুলি হলো বিরোধী দলের নমিনেশনে কারচুপি, নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে অন্যায়ভাবে ৮২ জনের নাম বাতিল করে শাসকদলকে জিতিয়ে দেওয়া, সৌদি আরবে হজ করতে যাওয়া ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দেওয়া, মনোনয়ন পত্রের সঙ্গে বি-ফর্ম ছিনিয়ে নিয়ে নমিনেশন বাতিল করা ইত্যাদি।

ভারতবর্ষের কোনো রাজ্যে এই ধরনের ঘটনা বিরল বলেই শোনা যায়। চারিদিকে শাসকদলের সন্ত্রাস এবং ভয়ের পরিবেশ। বহু স্থানে রক্তের হোলি খেলা চলেছে। গ্রামে বহু মানুষ আতঙ্কিত হয়ে ইতিমধ্যে ঘরছাড়া হয়েছেন। নির্বাচনের এখনও ১৫ দিন বাকি। শান্তি রক্ষায় কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগে নির্বাচন কমিশন ও আদালতের মধ্যে লুকোচুরি খেলা চলছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কমিশন বহু টানাপোড়েনের পর ৮২২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর আবেদন করেছে। এক দফায় ভোট হওয়ার ফলে এই পরিমাণ বাহিনী অপর্যাপ্ত বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। তারপর নির্বাচনে বাহিনীর উপযুক্ত নিয়োগ না হলে অর্থাৎ হাজার দুয়ারী ঘোরানোর মতো ব্যবস্থা থাকলে নির্বাচনের নামে প্রহসন হবে এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে কোনো লাভ হবে বলে মনে হয় না। ঘরপোড়া গোরু যেমন সিঁদুরে মেঘ দেখলে আঁতকে ওঠে, সেইরকম ২০২১ সালের নির্বাচনোত্তর হিংসার কথা ভেবে গ্রামাঞ্চলের মানুষ এখন আতঙ্কিত। এখনও পর্যন্ত যা খবর পাওয়া গেছে, বহু প্রার্থী, প্রস্তাবক ও বিরোধীদলের নেতা কর্মীরা পরিবার-সহ গৃহছাড়া হয়েছেন। কোনো কোনো বিরোধী দল তাদের কর্মী ও প্রার্থীদের নিরাপত্তার স্বার্থে অস্থায়ী শিবির খুলতে বাধ্য হয়েছে। এই ভাবে বিরোধীদের স্বাধীনভাবে নির্বাচনী প্রচার করার অধিকার হরণ করা হয়েছে।

নির্বাচনকে প্রহসনে রূপান্তরিত করা হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনও নিরপেক্ষতা হারিয়েছে। শাসক ও পুলিশের চরম গুন্ডামির মাধ্যমে বিরোধী দলের প্রার্থীদের শান্তিপূর্ণ ভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না দিয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী করাই তাদের মূল লক্ষ্য বলে অভিযোগ উঠেছে। এক কথায় বলা যায়, স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার চরম নিদর্শন। নির্বাচনের নামে দখলদারি ও ক্ষমতার আস্ফালন। বল প্রয়োগে বিরোধীদের নমিনেশন প্রদানে বাধাদান, হুমকি দিয়ে নমিনেশন প্রত্যাহার করানো এবং বিরোধী প্রার্থীদের ঘরবাড়ি

সম্পত্তি নষ্ট করে চরম সন্ত্রাস সৃষ্টি করাই হলো শাসকদলের লক্ষ্য। শাসকের হুমকিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইতিমধ্যে প্রায় ১২ শতাংশ প্রার্থী জয়লাভ করে গেছে। এই পঞ্চায়েত নির্বাচনের নমিনেশন পর্বেই মায়ের কোল খালি করে দেওয়া হয়েছে। অনেক পরিবার আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন এবং ইতিমধ্যে বেশ কিছু পরিবার প্রাণের ভয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। মধ্যযুগীয় বর্বরতার নিদর্শন স্বরূপ শাসকদলের তরফে অনেক বিরোধীদের হমকি দিয়ে বাড়িতে সাদা থান কাপড় পাঠানো হয়েছে।

ক্যানিং, ভাঙড়, চাকদা, বসিরহাট, দিনহাটা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় চরম হিংসা ও সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। আগামী দিনে ভোটের ফলাফল পর্যন্ত আরও কত হিংসাত্মক ঘটনা ঘটবে এবং কত মায়ের কোল খালি হবে, তার আশঙ্কায় গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের ঘুম ছুটেছে। জেলায় জেলায় শাসকদলের মদতে গ্রামেগঞ্জে বোমের পাহাড় তৈরি হয়েছে। সংবাদপত্রে প্রকাশ, নির্বাচনের প্রাক্কালে শাসকদলের নেতা পিস্তল নিয়ে প্রকাশ্যে হুমকি দিয়ে চলেছে। বাঙ্গলায় নিত্যদিন বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় অনেক লোকের মৃত্যু হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যায়, নির্বাচনে রাজনৈতিক হিংসা ও সন্ত্রাসের কারণে

কোনো স্বচ্ছ ভাবমূর্তির লোক আজকাল রাজনীতিতে আসতে চান না। সেজন্য রাজনীতি আজ কলুষিত হয়ে সমাজবিরোধী ও দুর্বৃত্তের আড্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে, এখানে আইনের শাসন নেই, শাসকের আইন রয়েছে। জনগণ ও মহামান্য আদালতের আর রাজ্য পুলিশে আস্থা নেই। সেজন্য সর্বত্র কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে শাসকের দুর্নীতির তদন্ত চলছে। পশ্চিমবঙ্গে শাসকদলের মদতে গণতন্ত্রের অন্তর্জলি যাত্রা শুরু হয়ে গেছে। দল, প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন একাকার হয়ে গেছে। সুতরাং পুলিশ প্রশাসনের কাছ থেকে নিরপেক্ষতা আশা করা অর্থহীন। অভিযোগ উঠেছে পুলিশ প্রশাসন আজ দলদাসে পরিণত। সেজন্য আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি। আমরা দেখেছি শাসকদলের ক্যাডারের ভয়ে এখানকার পুলিশ টেবিলের তলায় লুকিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই রাতের বেলায় ভবানীপুর থানা থেকে পুলিশকে ধমকে দিয়ে লকআপ থেকে অভিযুক্তকে ছাড়িয়ে এনেছেন। সুতরাং পুলিশের মনোবল তলানিতে ঠেকেছে বলে বিরোধীরা মনে করছেন। পুলিশকে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে কাজ করতে না দিলে, সমাজে অপরাধ প্রবণতা যে বৃদ্ধি পাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্মদাতা হলো সিপিএম পার্টি। পঞ্চায়েত ও অন্যান্য নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রতিটি নির্বাচনে হিংসার পরিবেশ সৃষ্টি করা, রাজনৈতিক হত্যা, ভয় ও সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে হুমকি দেওয়া ও সম্পত্তি ভাঙচুর করা, ভোটে রিগিং ও বুধ দখল করা, ভোটের আগের দিন রাতে বিরোধীদের বাড়িতে হুমকি দিয়ে ভোট প্রদানে বাধা দেওয়া, বিরোধী প্রার্থীদের বাড়িতে হুমকি দিয়ে সাদা থান কাপড় পাঠানো ইত্যাদি সিপিএম রাজত্বে আমরা দেখেছি। তাই তদানীন্তন নামি সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত সিপিএমের রিগিংকে বৈজ্ঞানিক রিগিং আখ্যা দিয়েছিলেন। এরই অঙ্গ হিসেবে মৃত ভোটারদের নামে ভোট দেওয়া, অনুপস্থিত ও বিরোধী ভোটারদের আগাম ভোট দিয়ে দেওয়া, অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার লিস্টে নাম তুলে দেওয়া এবং ভুতুড়ে ভোটার তৈরি করে জাল ভোট দেওয়া ছিল সিপিএমের কারসাজি। ভোটের নামে রক্তের হোলি খেলা এবং নির্বাচনকে প্রহসনে রূপান্তরিত করা ছিল বামেদের সংগঠিত অপরাধ।

নির্বাচন ছাড়াও গ্রামেগঞ্জে হিংসা, চরম সন্ত্রাস, বিরোধীদের ঘরছাড়া, সবক্ষেত্রে পার্টির দখলদারি, শিক্ষাক্ষেত্রে দলবাজি, প্রশাসনে দলবাজি এবং সর্বত্র লাল ঝান্ডার মোড়কে মুড়ে দেওয়ার প্রবণতা ছিল। এমনকী ভূমি সংস্কারের নামে গ্রামেগঞ্জে চাষের জমিতে লাল ঝান্ডা পুঁতে জমির দখল নেওয়া ছিল সিপিএমের জলভাত। অতীতের এই কুকর্মের প্রেক্ষিতে বামপন্থীরা তৃণমূলের নির্বাচনী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নৈতিক অধিকার হারিয়েছে। তবে দলমত নির্বিশেষে যে কোনো মৃত্যু অবশ্যই নিন্দনীয়। তবে সিপিএম এখন ঘোলা জলে মাছ ধরতে ব্যস্ত। ৩৪ বছরের অপশাসনের ফলে এই মুহূর্তে বাঙ্গলার জনগণ বামপন্থীদের ফিরিয়ে এনে দ্বিতীয়বার ভুল করবেন বলে মনে হয় না। বর্তমান শাসকদল তৃণমূল সেই সিপিএমের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আরও এগিয়ে চলেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সিপিএম শাসনের অতীত কাহিনি উপস্থাপন করার অর্থ এই নয় তৃণমূলের দুর্নীতি, গুন্ডাবাজি, সন্ত্রাস ও রক্তক্ষয়ী হিংসাকে ন্যায়সঙ্গগত প্রতিপন্ন করা। কেবলমাত্র বলা যায়, হিংসার সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে হিংসার কবল থেকে মুক্ত নয়। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, দুটি দলের মূলগত রাজনৈতিক চরিত্র প্রায় এক। সুতরাং জোর দিয়ে বলা যায়, দুটি দলই পশ্চিমবঙ্গের এই অবনতির জন্য দায়ী।

সিপিএমের অত্যাচারী শাসনের অবসানের জন্য ২০১১ সালে মমতার মাধ্যমে জনগণ সরকার পরিবর্তন করেছিল ঠিকই কিন্তু বিগত বারো বছরে মমতার শাসনে জনগণের মোহভঙ্গ হয়েছে। মানুষ অনুধাবন করেছে পরিবর্তনের নামে আর একটি দুর্নীতিগ্রস্ত ও অত্যাচারী শাসনকে ফিরিয়ে এনেছে। পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভাগ্য যে বামফ্রন্টের ৩৪ বছর এবং তৃণমূলের ১২ বছরের মোট ৪৬ বছরের শাসনকালে এ রাজ্যের সর্বনাশ হয়ে গেছে। দখলদারি ও হিংসার রাজনীতির পরাকাষ্ঠে শিল্প, শিক্ষায় ও স্বাস্থ্যে এ রাজ্যের বহু মানুষ পেটের দায়ে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে অন্য রাজ্যে পাড়ি দিয়েছে। সিপিএম ও তৃণমুলের দীর্ঘ অপশাসনের পরিপ্রেক্ষিতে হিংসা ও সন্ত্রাসমুক্ত পশ্চিমবঙ্গ গড়তে হলে জনগণকে বিকল্প কোনো দলের কথা অবশ্যই ভাবতে হবে, নতুবা ভবিষ্যতে এ রাজ্য আরও অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যাবে। হিংসামুক্ত সমাজ গড়তে জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস হওয়াও একান্ত জরুরি। ■

লোকপ্রজ্ঞার উদ্যোগে কৃতী বিদ্যার্থী ও রত্নগর্ভা মায়েদের সংবর্ধনা

প্রজ্ঞাপ্রবাহের পশ্চিমবঙ্গ শাখা লোকপ্রজ্ঞার উদ্যোগে গত ১৮ জুন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ কৃতী ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের রত্নগর্ভা মায়েদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সভাকক্ষে।

অনুষ্ঠান শুরু হয় লোকপ্রজ্ঞার পরম্পরা মেনে সংগঠন মন্ত্রের মাধ্যমে। উপস্থিত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সম্পাদক স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন নরেন্দ্রপুর বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক স্বামী ইষ্টেশানন্দ মহারাজ, সিস্টার নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য ড. ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় এবং গবেষক ও গ্রন্থ প্রণেতা ড. অমিত ভট্টাচার্য। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন পার্থজিৎ সেনগুপ্ত। স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রজ্ঞাপ্রবাহ পূর্বক্ষেত্রের সংযোজক অরবিন্দ দাশ। ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে শুভেচ্ছাবার্তা প্রদান করেন স্বামী ইষ্টেশানন্দ মহারাজ, ড. ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় ও ড. অমিত ভট্টাচার্য। ভাবগম্ভীর পরিবেশে ৭৮ জন কৃতী ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের রত্নগর্ভা মায়েদের সংবর্ধনা জানান স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ মহারাজ, স্বামী ইষ্টেশানন্দ মহারাজ, বিশেষ অতিথিগণ এবং লোকপ্রজ্ঞার পদাধিকারীগণ। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন কৃতী শিক্ষার্থীদের পরিবার-সহ ৩৫০ জন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে তিনটি পুস্তক প্রকাশ করা হয়। স্বামী জ্ঞানলোকানন্দজীর 'মূল্যবোধে ধন্য জীবন, ছাত্র সংস্করণ'। ব্রজকিশোর ঘোষের 'করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে' এবং দিগন্ত চক্রবর্তীর 'যেমন ছিল আমার দেশ ভারতবর্ষ'। সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ মহারাজ।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সন্দীপ সিনহা ও শ্রীমতী মৌমিতা বর। বন্দেমাতরম্ ও শান্তিমন্ত্রের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

শ্রদ্ধার শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠান

বীরভূমের বিশিষ্ট সামাজিক সংগঠন শ্রদ্ধা তাদের ১৩৬ তম শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে গত ১৮ জুন সিউড়ী কাছারিপাড়ার সুনীল কুমার ঘোষ মহাশয়কে। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন সিউড়ী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী বড়দানন্দ মহারাজ। শ্রীঘোষ মহাশয়কে মাল্যদানে ভূষিত করেন শ্রদ্ধার সভাপতি মহাদেব মুখোপাধ্যায়। তারপর তাঁর হাতে ফল, মিষ্টি, ধুতি, নামাবলি ও গীতা প্রদান করা হয়। মানপত্র পাঠ করেন ভারতীয় সেনাবহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সুবেদার জগৎবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করে তাঁর ছোট্টো নাতনি। শ্রদ্ধার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করেন প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী সুব্রত নন্দন ও অসীমা মুখোপাধ্যায়। শ্রীঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র সুরজিৎ ঘোষ তাঁর পিতার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। শেষে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন শ্রীমতী চৈতালি মিশ্র। শান্তিমন্ত্র পাঠ করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ভগিনী নিবেদিতা স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রে স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বস্তিবাসী মানুষদের কাছে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দিতে সমাজ সেবা ভারতী পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্প শুরু করেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি বস্তিতে একটি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। আপাতত দুজন কার্যকর্তা এক-একটি সেবাকেন্দ্রের দায়িত্বে থাকবেন। এই প্রকল্পের আওতায় সমাজ সেবা ভারতী পশ্চিমবঙ্গের উদ্যোগে কলকাতা ও হাওড়া মহানগরের সেবা বস্তির জন্য গত ১৮ জুন কলকাতার ভগিনী নিবেদিতা স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রে স্বাস্থ্য কার্যকর্তাদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ৬০ জন কার্যকর্তা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় উচ্চ রক্তচাপ কী ও কেন, রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস মাপা এবং নিয়ন্ত্রণের উপায়; বিভিন্ন স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সেবা প্রমুখ ধনঞ্জয় ঘোষ, সহ সেবা প্রমুখ প্রকাশ রঞ্জন মণ্ডল, বালমুকুন্দ প্রসাদ, ডাঃ প্রভাত সিং হ, কলকাতা মহানগর সেবা প্রমুখ প্রমোদ পুষ্টি, হাওড়া মহানগর সেবা প্রমুখ ধর্মেন্দ্রজী, সমাজ সেবা ভারতীর সম্পাদক রিপন দাস, কোষাধ্যক্ষ জিতেন্দ্র কুমার পাণ্ডে প্রমুখ।

বহরমপুরে সংস্কার ভারতীর প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

গত ১৬ জুন সন্ধ্যায় বহরমপুর কালেক্টরেট মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংস্কার ভারতীর প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হলো। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রীয় স্বংসেবক সঙ্ঘের নদীয়া বিভাগ সঙ্ঘচালক সমর রায়। এরপর সংস্কার ভারতীর ভাবসংগীত পরিবেশিত হয়। শ্রুতিমধুর বৈদিক সংগীত পরিবেশনে সকলকে মুগ্ধ করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্বপন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর সংস্কার ভারতীর শিল্পীদের দ্বারা সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, যন্ত্রসংগীত পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন মধ্যবঙ্গ সংস্কার ভারতীর সংগঠন সম্পাদক উদয় কুমার দাস। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন মুর্শিদাবাদ জেলা সংস্কার ভারতীর সভানেত্রী শ্রীমতী চিত্রা চৌধুরী। পূর্ণ বন্দে মাতরম্ সংগীতের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা হয়।

With Best Compliments from -

ARDA

অধিক দুধ উৎপাদন ও গবাদি পশুর সুস্বাস্থ্যের জন্য সমস্ত দুধ উৎপাদকগণের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য

- আলো বাতাসযুক্ত পরিষ্কার পরিবেশ শুকনো সমতল গোয়ালের ব্যবস্থা করুন।
- গবাদি পশুকে সুষম খাদ্য খাওয়াবেন, যার মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ইত্যাদি উপযুক্ত মাত্রায় রয়েছে।
- একবার খাওয়ালে হজম করতে ৮ ঘণ্টা সময় লাগে, তাই দিনে দু'বারই খাবার দেবেন।
- গবাদি পশুকে খাওয়াবার এক থেকে দুই ঘণ্টা পর জল খাওয়াবেন।
- গবাদি পশুকে প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে সবুজ ঘাস খাওয়াবেন।
- মশা, মাছি, এটুলি থেকে গোয়ালঘরকে মুক্ত রাখতে পারলে গবাদি পশুকে অনেক ভয়ঙ্কর রোগ থেকে রক্ষা করা যাবে।
- অম্বল বা বদহজম থেকে আপনার গবাদি পশুকে রক্ষা করতে ভাত সেদ্ধ খাবার বা ভিজিয়ে খাবারের অভ্যাস ত্যাগ করুন।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গ্রামসভা আবার ফিরে আসুক

হরিমোহন দাস

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়েছে। মনোনয়ন পর্বেরও সমাপ্তি হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখছি রাজ্য নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করতেই রাজ্যের বিরোধী দলগুলি ও রাজ্য নির্বাচন কমিশন হাইকোর্টে, সুপ্রিমকোর্টে ছুটোছুটি শুরু করেছে মনোনয়নের সময় সীমা বাড়ানো, কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করার দাবি নিয়ে। অন্যদিকে দেখেছি মহামহিম রাজ্যপাল ক্যানিং-সহ অন্যান্য অঞ্চলে আতঙ্কিত, ভীত-সন্ত্রস্ত এলাকায় পরিদর্শনে যাচ্ছেন। মানুষের মৃত্যুর খবর আসছে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে, তাই রাজ্যপাল রাজভবনে পিসরুম খুলেছেন। রাজ্যের বিরোধী দল নিজের অত্যাচারিত কর্মীদের জন্য সেভ হাউসের ব্যবস্থার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুন হয়েছে মুর্শিদাবাদে, দিনহাটায়। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ও মানুষ ভাবছে হাইকোর্ট কি বলবে, সুপ্রিম কোর্ট কি নির্দেশ দেবে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করবার?

ইদানীংকালে ভারতের রাজ্য-রাজনীতিতে কোর্ট একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে সরকার গড়া-পড়া ইত্যাদি বিষয়ে কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোর্টের ভূমিকা পালনের কথা ছিল। পঞ্চায়েত নির্বাচনে, পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গ্রামসভার একটা সাংবিধানিক ভূমিকা ছিল যা আপামর পশ্চিমবঙ্গবাসী ভুলেই গেছে। আমরা যখন ভোটার হইনি সেই সময়ে দেখেছি, গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাগজে লিখে বিলি করতেন। বলতেন অমুক দিন গ্রামসভা আছে ওখানে সবাইকে উপস্থিত থাকতে হবে। আমাদের যাবার অধিকার না থাকলে আমরা ছোটোরা গ্রামসভায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম, দেখতাম পঞ্চায়েত প্রধান আসতেন গ্রামের মানুষের সুযোগ সুবিধার কথা শুনতেন।

বড়ো হয়ে ইতিহাসের পাতা উলটে দেখলাম ১৯৫৭ সালের বলবন্তরাই মেহতা কমিটির সুপারিশে জাতীয় সম্প্রসারণ পরিষেবা ব্যবস্থা এবং ১৯৫৮ সালে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের ফসল হচ্ছে আমাদের এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। সংবিধানের ৪০নং অনুচ্ছেদে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কথা থাকলে কেন বুঝি না ৬৪তম ও ৭৬তম সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হলো পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে। গ্রামসভার ভূমিকা সম্পর্কে যে কথাগুলো উল্লেখনীয় তা হলো গ্রামের যারা ভোটার তাদের নিয়েই তৈরি হতো গ্রামসভা। পঞ্চায়েত প্রধানকে নানান উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার বিষয়ে প্রশ্ন করার অধিকারী গ্রামসভা। গ্রামের কোন পরিবারের কোন পরিষেবার প্রয়োজন তা গ্রামসভাই ঠিক করে পঞ্চায়েত প্রধানকে বলবে। এবং এটাও লক্ষ্য করার বিষয় পঞ্চায়েত ভোটের আগে গ্রামসভার বৈঠক অনিবার্য ছিল। যা আজ সারা দেশে কোনো রাজ্যেই মানা হয় না। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন প্রত্যেকটা বুথকে কোনটা এসটি, এসসি, ওবিসি মহিলা, জেনারেল ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করেছে কাদের মতামত নিয়ে? গ্রামের মানুষ তো পরে জানতে পারছে তাদের গ্রামের সিট, অমুক নামে সংরক্ষিত হয়েছে, কিন্তু এটা হওয়ার কথা ছিল

With Best Compliments From :-

RTS POWER CORPORATION LIMITED

Manufacturers of

E. H. V. GRADE TRANSFORMERS

From 25 KVA to 40 MVA, 132 KV Class

HEAD OFFICE
56, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001
Phones : (033) 2242-6025 / 6054
Fax No, : (033) 2242-6732
E-mail : rtspower@vsnl.net
pkgoswamy@gmail.com

JAIPUR WORKS :
C-174, Vishwakarma Industrial Area, Chomu Road, Jaipur - 302 013
Phone No. : 2330-405 / 2330-269
Fax No. : 0141 2330315
email : rtspower@sancharnet.in

HOWRAH WORKS:
Jaladhulagari
Dhulagarh, Sankrail,
Howrah - 711 302

AGRA WORKS :
Mathura Road, P.O. Artoni, Agra - 282 007
Phone No. : (0562) 2641-431

Associate Concern
ABHAY TRANSFORMERS & SWITCHGEARS
O. T. Road, Balasore (Orissa)
Phone No. BLS 262319
Tele fax : BLS 263875

গ্রামসভার মাধ্যমে। তাই পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে সংবিধানে স্থানীয় স্বায়ত্ত ব্যবস্থা বলা হয়েছে।

সাধারণ মানুষ কিন্তু রাজনীতি মানে রাজার নীতি বলেই জানি, তাই আমরা ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের শাসন ব্যবস্থাকে ঠিক ভাবে বিচার মন্থন করি তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে তাঁর শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ নীতিকে যেভাবে একটি ছোট্ট পরিসরের রাজা হয়েও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন আজকের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় তার ছায়া বর্তমান। শিবাজী তাঁর শাসনব্যবস্থায় রাজ্যকে ছোটো ছোটো প্রান্তে ভাগ করেছেন। অষ্টপ্রধান নিযুক্ত করেছেন, জেলায় জেলায় সরকারি কর্মচারী নিয়োগ করেছেন, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বয়ংসম্পূর্ণ শাসনতন্ত্র, যার মধ্যে লুকিয়ে ছিল বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনীতির ধারাপ্রবাহ। তাই প্রাচীনকালে আমাদের দেশের গ্রামে গ্রামে জনকল্যাণকামী চিন্তাধারা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। গ্রামগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বয়ংসক্রিয় ছিল। গ্রামের প্রয়োজনীয় জিনিস গ্রামেই উৎপাদন করার ব্যবস্থা করে গ্রামবাসী। গ্রামের মানুষদের সেই সময়ে মাটির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের ব্যাপক বিস্তৃত পরিসরের মধ্যেই আজকের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা স্বরূপ গড়ে উঠেছে।

প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে দেখলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা হলো একটা ভালো টিম ওয়ার্ক, যেখানে কিনা সক্রিয় ভাবে উন্নয়ন ও জাতি গঠনের কাজে গ্রামের মানুষ মুক্ত মনে অংশগ্রহণ করে। এই ব্যবস্থার পরিধিকে এত মজবুত ভাবে আমাদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসক অনুভব করবেন তাঁরা জনতার প্রভু নন, সেবক। তাই পশ্চিমবঙ্গের ২০২৩-এর এই যে পঞ্চায়েত নির্বাচন যা ৮ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে আমরা ভোটাররা আরও সচেতন ও সজাগ হয়ে দায়বদ্ধ, দক্ষ ও সৎ প্রশাসক নির্বাচন করব। উন্নয়নের স্বার্থে আন্তরিকতার মুখটি নির্ধারণ ও নির্বাচিত করব। ভারতীয় গণতন্ত্র সাবালক হয়েছে একথা আমরা স্বাধীনতার এত বছর পরেও বলতে পারি না, প্রশাসনিক ব্যবস্থার এখনো অনেক পরিবর্তন চাই। গ্রামীণ অর্থনীতির এই বণ্টন ব্যবস্থার অঙ্গস্বরূপ পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আমাদের ঢেলে সাজাতে হবে। রাজনৈতিক নেতাদের মনে ঢুকেছে যে, পঞ্চায়েত হলো মধু ভাণ্ড। সমস্ত সরকারি টাকা হলো লুটের মাল। একবার পঞ্চায়েত দখল করলেই কেল্লাফতে। তাই জনপ্রতিনিধিত্ব রাজনীতিতে পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে এ ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও পঞ্চায়েত নির্বাচন হলো জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন ।

আমরা যারা পশ্চিমবঙ্গবাসী পঞ্চায়েতে ভোট দিতে যাবো আমাদের মনে রাখতে হবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় কিন্তু কোনো কর কাঠামোর ব্যবস্থা নেই। পঞ্চায়েত কাজ কী করবে তার বিবরণ তো আছে কিন্তু টাকা কোথা থেকে আসবে? টাকা লাগে দেবে গৌরী সেন তা তো আর হবে না কেন্দ্র সরকারের অনুদান, রাজ্য সরকারের অনুদান। সেই অনুদানের টাকার অধিকার পাবার জন্য এত হুড়োহুড়ি লম্ফঝম্প কেন? এটাই তো আমাদের মূল ভাবনার বিষয়বস্তু হওয়া উচিত এই সময়। পঞ্চায়েতের টাকায় গ্রামের স্বাস্থ্যপরিষেবা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, পুকুর খনন, পানীয় জলের ব্যবস্থা, হস্ত ও কুটীর শিল্পের প্রসার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ভারতের অর্থনীতির বণ্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার কথাই তো রয়েছে সংবিধানে। এর সঙ্গে আরও যেগুলো যুক্ত হবে বৃক্ষরোপণ, বৃক্ষ পরিচর্যা, স্থায়ী সম্পদ নির্মাণ ও কৃষিজমির সুষম বিন্যাস। আজ সারা পশ্চিমবঙ্গে নিশ্চিত ভাবে কিছু কিছু স্থানে কিষাণমাণ্ডী আছে কিন্তু বেশিরভাগ ব্লকেই চাষিদের যত্র তত্র সোনার ফসল নিয়ে বসে থাকতে হয় অর্থাৎ কৃষি পণ্যের বাজারজাত ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। তাহলে প্রশ্ন আসবে এতগুলো বছরেও কেন সেই পরিকাঠামো তৈরি হলো না?

কেন ডিভিসির মতো আর কোনো প্রজেক্ট তৈরি হচ্ছে না। তাই আমরা যারা ভোট দেব, আমরা রাজ্য সরকারের প্রকল্পের সুবিধা নেব আর কেন্দ্র সরকারের প্রকল্পের সুবিধা নেব। কিন্তু সরকার স্থায়ী নয়, আজ যে সরকার ৫০০ টাকা দিচ্ছে পরবর্তী সরকার ১০০০ টাকাও দিতে পারে। কেউ সাইকেল দিচ্ছে, তো কেউ-বা দিচ্ছে স্কুটি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন— 'দরিদ্রকে সেবা করিয়া, উপবাসীকে অন্ন দিয়া, দরিদ্রকে ভিক্ষা দিয়া দারিদ্র দূরীকরণ সম্ভব নহে। যতক্ষণ না তুমি মনের দরিদ্রতা দূর করার উপায় বলে দিচ্ছ, স্থায়ীভাবে দারিদ্র দূর করার প্রকল্প তাকে দিচ্ছ, স্থায়ীভাবে তার মনে আশার সঞ্চার না করছো, যতক্ষণ না তার মনে স্থায়ী স্বাভিমানের সৃষ্টি করছো। স্বাভিমান ছাড়া দারিদ্র্য দূরীকরণ হয় না। রবীন্দ্রনাথ এখানে 'সাবলম্বী হওয়ার স্বাভাবিমানের কথা বলেছেন, যা ব্যক্তিকে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য সচেষ্ট হতে সাহায্য করবে। কিন্তু ভোট রাজনীতির জাঁতাকলে সামাজিক স্বাভিমানেরও কথা এখানে এসে পড়ে। ভারতের সংবিধান জাতীয় ঐক্যের কথা বললেও ভোটের অঙ্কে জাতপাত, শ্রেণী বিন্যাস সমাজ ব্যবস্থাকে বিধ্বস্ত করছে। তাই পশ্চিমবঙ্গের ভোটাররাও ভোট দেওয়ার সময় নিজের নিজের সমাজের অবস্থানের স্বরূপকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক কাম্য হয়ে পড়েছে।

স্বাভিমান ছাড়া দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব নয়। তবুও দেশ বাঁচাতে জাতীয় স্বার্থের স্বাভিমান, সাংস্কৃতিক স্বাভিমান বোধে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। তা না হলে সমগ্র সামাজিক ব্যবস্থা একদিন ভেঙে পড়বে। সামাজিক পরিচয় ও রাজনৈতিক পরিচয়ের পরিসর ভেঙে দিয়ে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর স্বনির্ভর ভারত, আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তুলতে হবে। আত্মকেন্দ্রিক ভারত আমরা কেউ-ই চাই না, কিন্তু আত্মমন্থনের দৃষ্টিতে বর্তমান কেন্দ্র সরকারের কাছে আমার অনুরোধ পঞ্চায়েত ব্যবস্থা যে 'গ্রাম সভার' ভূমিকা ছিল তা যারা ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা করা হোক। তাহলে দলমত নির্বিশেষে সব গ্রামবাসী একসঙ্গে নতুন ভারত গঠনে অগ্রসর হবে। সেই প্রত্যয় ও প্রতীক্ষা নিয়েই দেশ বাঁচবে, দেশ নতুন পথের দিশারি হয়ে উঠবে। ▯

THE CO-WORKING EXPERIENCE

BECOME A MEMBER OF CORNER DESK

Co-working offers more freedom, independence, possibilities for self-realisation.

At the Heart of Kolkata in Chandani Chowk

Address : 4th Floor, 10 Raja Cubodh Mullick Square

Don't be afraid to give up the good to go for the great.

FOR DETAILS CONTACT : 9836054628 I 8334051100

শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটাতে চেয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ

ড. তরুণ মজুমদার

ঔপনিবেশিক যুগের অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত বলবান এবং একইসঙ্গে সরকারি ও রাজনৈতিকভাবে মদতপুষ্ট মরু সংস্কৃতির সর্বগ্রাসী করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করে নির্বীজ নিম্নত্ববোধ-লাঞ্ছিত বাঙ্গালি জাতিকে যে মহানুভব নিশ্চিন্তে শ্বাস নেওয়ার জায়গা করে দিয়েছিলেন; স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে বাঙ্গলা মায়ের সেই শ্রেষ্ঠ সন্তানকেই সুযোগসন্ধানী অসাম্য-সঞ্জাত বিজাতীয় বুদ্ধিজীবী বিশ্লেষকরা সুকৌশলে সাম্প্রদায়িক বলে দাগিয়ে দিলেন। এই মনোজাগতিক চ্যুতি ও ঐতিহাসিক বিকৃতির প্রেক্ষাপটে অকৃতজ্ঞ বিস্মরণশীল বাঙ্গালি জাতির সামনে শিক্ষাবিদ হিসেবে ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির উন্নত মনীষাকে প্রকাশ করা বর্তমান সময়ের দাবি।

ঔপনিবেশিক শাসনের গোধূলি বেলায় বাঙ্গলার সার্বিক অরাজক পরিস্থিতিতে শিক্ষাক্ষেত্রে শ্যামাপ্রসাদের অন্তরঙ্গ প্রচেষ্টা এক যুগসন্ধিক্ষণের সূচনা করে। ১৯২৪ সালে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আকস্মিক প্রয়াণের পর মাত্র ২৩ বছর বয়সে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক সংগঠন সেনেটের সদস্য হিসেবে মনোনীত হন। সেনেটের সদস্য হিসেবে তাঁর সদর্থক ভূমিকা আজও অত্যন্ত স্মরণীয়। এই সময় তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার প্রসারের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। শ্যামাপ্রসাদের জীবনের আধারে লেখা লোকসভা সেক্রেটারিয়েটের 'এমিনেন্ট পার্লামেন্টারিয়ানস'-এর পৃষ্ঠা চারে লেখা আছে, 'ছাত্র বয়স থেকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে বাবাকে সাহায্য করতেন শ্যামাপ্রসাদ।' সেনেটের সদস্য হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করার দাবি তুলেছিলেন তিনি।

শ্যামাপ্রসাদের যখন ৩৩ বছর বয়স, তখন তাঁর স্ত্রী'র মৃত্যু হয়। স্ত্রী'র প্রয়াণের

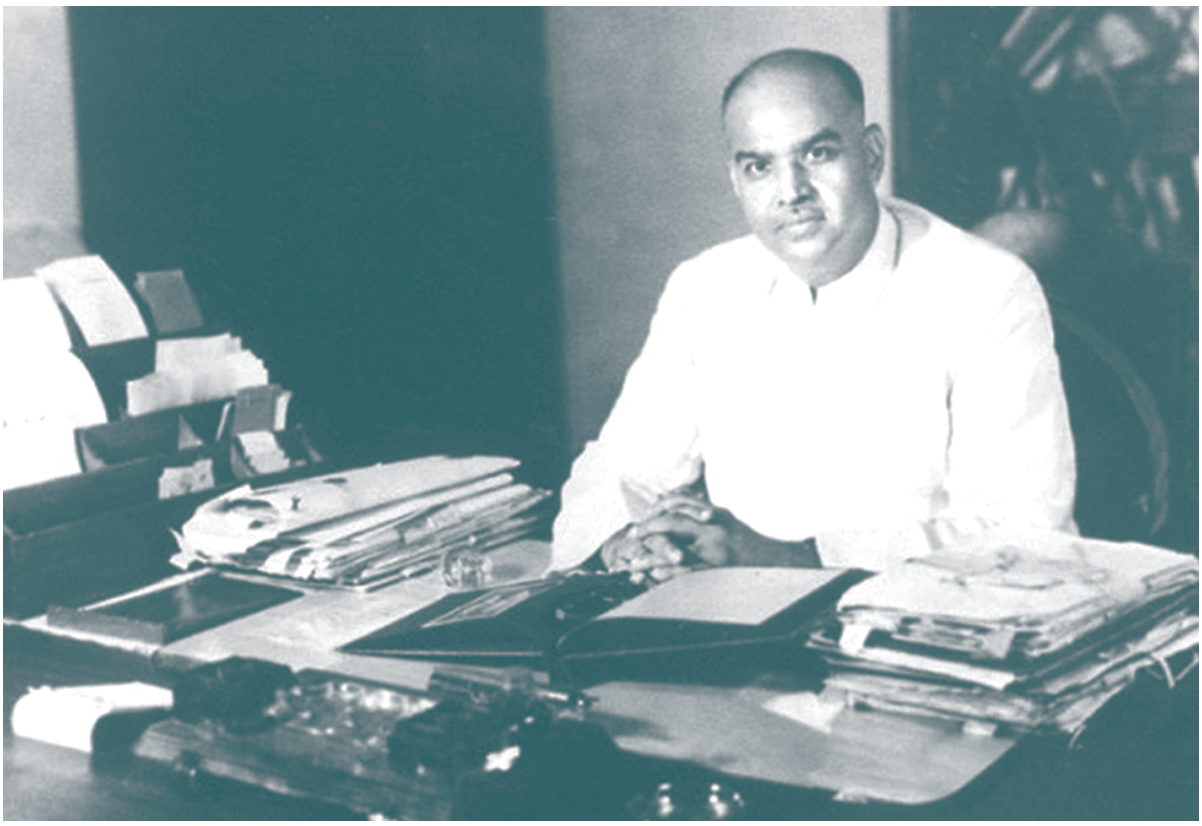

ফ ঃ ৫

With Best Compliments from

P. C. CHANDRA JEWELLERS ®

A jewel of jewels

pcchandraindia.com | amazon | GET IT ON Google Play Download Now

Follow us on /pcchandrajewellersindia

+918010700400 (Except Sunday)

OUR SHOWROOMS

Bowbazar | Gariahat | Chowringhee | Ultadanga | Golpark | Barasat | Behala | Arambagh
Balurghat | Bankura | Cooch Behar | Katwa | Krishnanagar | Malda | Purulia | Siliguri
Siuri | Tamluk | Agartala

ALL THE BELOW MENTIONED SHOWROOMS WILL REMAIN OPEN ON SUNDAYS

Hatibagan | New Town | Howrah | Serampore | Chandannagar | Sodepur | Habra | Kanchrapara
Baruipur | Barrackpore | Asansol Berhampore | Burdwan | Durgapur | Midnapore | Raiganj | Delhi
Bengaluru (Ulsoor & Koramangala) | Bhubaneswar | Jamshedpur | Noida | Mumbai | Ranchi

বছরেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে কমবয়সি উপাচার্য হিসেবে নিযুক্ত হন তিনি। সম্ভবত তিনিই ছিলেন বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ উপাচার্য। ছাত্ররা যাতে নিজেদের প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হয়, তার জন্য উপাচার্য হিসেবে ছাত্রদের ইউনিয়ন গঠনের উদ্যোগ নেন তিনি। ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৮, এই চার বছরের মেয়াদে তাঁর উদ্যোগে অনেক নতুন শাখায় পড়াশোনা শুরু হয়। যার মধ্যে ছিল মহিলাদের জন্য বিশেষ পাঠ্যক্রম এবং গৃহবিদ্যার পঠনপাঠন। কৃষিবিদ্যা নিয়ে লেখাপড়ার শুরুও তাঁর হাতে। স্কুলশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের উপরে তিনি বিশেষ জোর দেন। চৈনিক ও তিব্বতীয় ভাষা নিয়ে চর্চার শুরু তাঁর হাতে। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে বড়ো অবদান ছিল, আশি বছরের ইংরেজির একাধিপত্য ভেঙে বাংলা মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া। রবীন্দ্রনাথকে 'বিশিষ্ট প্রফেসর' হিসেবে নিয়োগ করার কৃতিত্বও তাঁর। ১৯৩৭ সালে শ্যামাপ্রসাদের উদ্যোগে এবং ঐকান্তিক ইচ্ছায় প্রথম বাংলা ভাষায় সমাবর্তনী ভাষণ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। হিন্দি ও উর্দু ভাষার শিক্ষাকেও প্রাধান্য দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। স্নাতক স্তরে অসমীয় ভাষা চালু করেছিলেন। কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, জনস্বাস্থ্য, পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ববিদ্যা, অঙ্ক ও এরোনটিক্স শাখায় পঠনপাঠনের শুরুও তাঁরই হাত ধরে।

শ্যামাপ্রসাদ ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসন ও বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে কথা বলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অত্যধিক সরকারি হস্তক্ষেপ ছাড়াই তাদের পাঠ্যক্রম বিকাশ, শিক্ষক নিয়োগ এবং অন্যান্য বিষয়গুলি পরিচালনা করার স্বাধীনতা থাকা উচিত। তিনি অ্যাকাডেমিক উৎকর্ষ ও উদ্ভাবনের কেন্দ্র হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার ওপর জোর দেন। ১৯৩৮ সালে ভারতীয় বিদ্যাভবন নামে একটি অলাভজনক শিক্ষামূলক ট্রাস্ট গঠন করার সময় তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এই ট্রাস্টের লক্ষ্য ছিল শিক্ষার মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সংরক্ষণ ও প্রচার করা। ভারতীয় বিদ্যাভবন তখন থেকে ভারত জুড়ে অসংখ্য স্কুল, কলেজ ও প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছে, যা ভারতীয় ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে পাথেয় করে আজও শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে চলেছে।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদানগুলি হলো শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়ন, দেশে মর্যাদাপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, গবেষণা ও উদ্ভাবনে জোর দেওয়া এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নিম্নত্ববোধ- লাঞ্ছিত মনোজাগতিক চ্যুতির উর্ধ্বে তুলে তাদের জাতীয়তাবোধে জারিত করা।

ভারত সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী হিসেবে (১৯৪৭- ১৯৫০), শ্যামাপ্রসাদ বেশ কয়েকটি শিক্ষাগত সংস্কার শুরু করেছিলেন। তিনি নতুন স্কুল, কলেজ ও কারিগরি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা-সহ শিক্ষার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের দিকেও মনোনিবেশ করেন।

পশ্চিমবঙ্গের খড়্গপুরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (আইআইটি) প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বা কলকাতায় ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্থাপনার ভাবনা, তাঁর উন্নত মনীষার জ্বলন্ত উদাহরণ। তিনি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে গবেষণা এবং নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে গবেষণা ও উন্নয়ন জাতির অগ্রগতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষার প্রতি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষাবিদদের বাইরেও প্রসারিত ছিল। তিনি চরিত্রগঠন, নৈতিক মূল্যবোধ এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার উপর জোর দেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষার মাধ্যমে এমন বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো উচিত যা কিনা সমাজে ইতিবাচকভাবে অবদান রাখে। ১৯৫১ সালে লোকসভায় 'বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বিধি' সম্পর্কে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা না থাকলে এই সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন ছিল অসম্ভব। সেদিন তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, 'We do not want large buildings there.' অর্থাৎ বিশ্বভারতীর তপোবন সুলভ আশ্রমিক পরিবেশের ঐতিহ্য বজায় রাখার পক্ষে সওয়াল করার মাধ্যমে প্রাচীন ভারতীয় ঋদ্ধ ঐতিহ্যকে মেকি আধুনিকতার গ্রাস থেকে রক্ষার কথা ভেবেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ।

জীবদ্দশায় দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তনে দীক্ষান্ত ভাষণ দিয়েছেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। এর মধ্যে ১৯৩৭ সালে বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে 'University Education and our Destiny' শীর্ষক ভাষণে এবং ওই একই বছরে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'Role of the Universities in Making the Nation' শীর্ষক ভাষণের পর্যালোচনা করলে man making mission— সঞ্জীবিত শিক্ষা দর্শনকেই খুঁজে পাওয়া যায়, যা বিবর্তনের পথ বেয়ে make in India এবং নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির হাত ধরে হৃতগৌরবকে ছিনিয়ে আনতে দৃঢ়প্রত্যয়ী। সামগ্রিকভাবে, একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদানগুলি হলো শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়ন, দেশে মর্যাদাপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, গবেষণা ও উদ্ভাবনে জোর দেওয়া এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নিম্নত্ববোধ-লাঞ্ছিত মনোজাগতিক চ্যুতির উর্ধ্বে তুলে তাদের জাতীয়তাবোধে জারিত করা। এক কথায় নারায়ণের মেধা এবং নারায়ণী সেনার বন্দোবস্তের অদ্ভুত মিশেল স্বরূপ এক ধ্রুপদী চরিত্রের আধারের নাম হলো ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। □

With best Compliments from :

CASTRON TECHNOLOGIES LIMITED

Manufacturer of :

FERRO MANGANESE

SILICO MANGANESE

LOW PHOS FERRO MANGANESE

Regd. office :

14, Bentinck Street, 1st floor, Room No. 8

Kolkata - 700 001, West Bengal (India)

Phone : (91-33) 22624465

Head Office :

Yogamaya, Dhaiya, Post - Nag Nagar

DHANBAD - 826 004, Jharkhand (India)

Phones : (91-326) 2207886, 2203390

Fax : (91-326) 2207455, E-mail : atul@castrontech.com

Works :

Phase- III/B-4, B-5, Bokaro Industrial Area

Balidih, Bokaro Steel City - 827 014

Jharkhand (India)

Phones : (91-6542) 253511, Fax : (91-6542) 253701

একদা ছোলাভাজা বিক্রেতা আজ প্রতিষ্ঠিত খাদ্যপণ্য ব্র্যান্ডের মালিক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনার মাধ্যমে এক লক্ষ টাকা ঋণ সংগ্রহ করে ২ রকমের খাবার বানিয়ে সরবরাহ করা শুরু করেছিলেন। সেই শুরু। অজিত শর্মা বড়ুয়ার সেই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আজ পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভোগালী জলপান নামক এক বড়ো মাপের ব্র্যান্ডে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে ৩২ রকমের খাবার সরবরাহ করা এই কোম্পানির বার্ষিক টার্নওভার ৬ কোটি টাকা এবং ৮০ জনের বেশি কর্মচারী এখানে কর্মরত।

অজিত শর্মা বড়ুয়ার জন্মস্থান অসমের শিবসাগর জেলার তেঙ্গা পুখুরী গ্রাম। শিবসাগর জেলা সদর থেকে ২৪ কিলোমিটার দূরে এই গ্রাম। চতুর্থ-পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থা থেকে তিনি তাঁর বাবার দোকানে নানা সামগ্রী প্যাকিঙের কাজে সাহায্য করতেন এবং এইভাবে প্যাকেজিং সম্পর্কে ধীরে ধীরে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেন। স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন ৩ মাসের ছুটিতে ছোলাভাজা প্যাকেটজাত করে সাইকেলে চেপে বিক্রি করতে বেরোতেন। গ্র্যাজুয়েশন সম্পূর্ণ হলে মায়ের নির্দেশে একটি কোম্পানিতে চাকরিতে যোগদান করেন। কর্মক্ষেত্রেও প্রাতরাশ ও কোমল চাউলের মতো অসমের পরম্পরাগত ও জনপ্রিয় খাবার প্রস্তুত করে সহকর্মীদের পরিবেশন করতেন। তাঁর ও সহকর্মীদের পছন্দের এইসব খাবার প্যাকেটজাত করে স্থানীয় দোকানদারদের মাধ্যমে বিক্রি করতে শুরু করেন। এইভাবে ব্যবসার সঙ্গে ধীরে ধীরে সংযুক্ত হয়ে পড়েন। অসমে চাল দিয়ে তৈরি হওয়া বিশেষ খাদ্যপণ্য — কোমল চাউল ও খন্ডৌরী তৈরি করে বিক্রি করতে শুরু করলেন। ব্যবসার জন্য অর্থের প্রয়োজন হলে প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনার অন্তর্গত জেলা রোজগার কেন্দ্র থেকে ১ লক্ষ টাকা ঋণ নেন এবং চাকরি ছেড়ে পুরোপুরি ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন। খাবারের রেসিপিতে প্রয়োজনীয় রদবদল ঘটিয়ে খাবারগুলোকে সুস্বাদু করে তোলেন এবং ভাজাভুজি জাতীয় খাদ্যসামগ্রী প্যাকেটজাত করেন যাতে সেগুলি দীর্ঘ সময় ধরে বিক্রির উপযুক্ত হয়ে থাকে।

কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দিয়ে দাঁড় করানো তাঁর এই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আজ গোটা অসম জুড়ে বিস্তৃত। দিল্লি, মহারাষ্ট্র-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হওয়া স্বদেশি দ্রব্যের মেলা ও শিল্পমেলাতে অংশগ্রহণ করে তাঁর এই প্রতিষ্ঠান অসমের ঐতিহ্যবাহী খাদ্যসামগ্রীর স্বাদ দেশের সেই সব প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। তাঁর নিরন্তর প্রয়াসের ফলে অসমের এইসব সুস্বাদু প্যাকেটজাত খাদ্যসামগ্রীর জনপ্রিয় এই ব্র্যান্ড ফিকি, সিআইআই-এর মতো বণিকসভার মাধ্যমে আজ আন্তর্জাতিক মেলাসমূহে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেছে। ব্যবসার ক্ষেত্রে নেওয়া ঝুঁকি ও চরম ধৈর্য আজ এই ব্র্যান্ডের প্রতিষ্ঠালাভের চাবিকাঠি। শিল্পস্থাপনে উদ্যোগী নতুন প্রজন্মের কোনো যুবকের সামনে অজিত শর্মা বড়ুয়া হলেন অনুপ্রেরণার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।□

টেকোর ইচ্ছা

এক গ্রামে এক টেকো ছিলেন। তার অবস্থা বেশ ভালোই। অনেক টাকাপয়সা, জমিজমা। কোনো কিছুরই অভাব নেই তার। তবু তার মনে শান্তি নেই। কেননা তার মাথায় একটাও চুল

নেই। টেকো মাথাটা বেশ একটা তামার পাত্রের মতো দেখতে লাগে। এনিয়ে অনেকেই তাকে ঠাট্টা তামাশা করে। লোকের কথায় সে বড়ো লজ্জা পায়।

টাকাপয়সার অভাব না থাকলেও লোকটি ছিল খুবই বোকা।

একদিন একজন ঠগ লোক এল তার কাছে। লোক ঠকানোই তার নেশা ও পেশা। সে টেকোকে বলল, দেখুন, আমার চেনাজানা এক বড়ো ডাক্তার আছে। তার কাছে এমন সব অব্যর্থ ওষুধ আছে, যা ব্যবহার করলে টাক মাথায় চুল গজাবেই গজাবে। আপনি যদি বলেন আমি আপনাকে তার সন্ধান দিতে পারি। ওর ওষুধ ব্যবহার করলে আপনার টাকে এমন চুল গজাবে যে লোকে তখন ঠাট্টা তামাশা তো দূরের কথা— আপনাকে দেখে লোকে হিংসেয় জ্বলবে।

শুনে তো টেকো আনন্দে আটখানা। বলল, ভাই, যত টাকা লাগে আমি খরচ করতে রাজি আছি। তুমি যত তাড়াতাড়ি পার ওই ডাক্তারকে আমারে কাছে নিয়ে এস। যদি সত্যিই আমার মাথায় চুল গজায় তাহলে যা টাকা লাগে তা তো দেবই, সঙ্গে তোমাকেও খুশি করে দেব।

এদিকে সেই দুষ্ট ঠগ লোকটি সুযোগ বুঝে নানা অছিলায় তার কাছ থেকে টাকা আদায় করতে লাগল। ডাক্তারকে আজ আনব, কাল আনব বলে রোজই টাকা হাতিয়ে নিতে লাগল। বোকা টেকো কিছু না বুঝেই টাকা দিয়ে যেতে লাগল। তার মনে বড়ো আশা, মাথায় চুল গজাবে।

এভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর ঠগ লোকটা সত্যিই একদিন এক ডাক্তারকে নিয়ে এল টেকোর কাছে। ডাক্তার বেশ কিছুদিন টেকোর চিকিৎসা করল। চিকিৎসার জন্য আরও অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল টেকোর। আসলে সেই ডাক্তারও ছিল এক মহাঠগ। মিছামিছি চিকিৎসার নামে সে বহু টাকা ঠকিয়ে নিল।

এদিকে বোকা টেকো কিছুই ধরতে পারছে না। সে পরম বিশ্বাসে, টাকে চুল গজানোর লোভে টাকা খরচ করেই চলেছে। একদিন ডাক্তারের বেশধারী সেই ঠগ নিজের মাথা থেকে টান মেরে পরচুলাটা খুলে ফেলল। তার মাথাতেও মস্ত টাক চকচক করছে। কিন্তু কী কাণ্ড! টেকো এতই ভালো মানুষ যে তখনও মহা খুশিতে ডাক্তারকে বিশ্বাস করে বসে আছে। বারবার শুধু বলছে, ভাই, তোমার ওই অব্যর্থ ওষুধটা দাও না আমায়। মাথাভর্তি চুলের বড্ডো শখ আমার। ওই টাকমাথা মোটেই ভালো লাগে না আমার। বড়ো লজ্জা লাগে টাকমাথা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে।

ঠগ ডাক্তার তখন হাসিতে হাসিতে গড়িয়ে পড়ে। টেকোকে বলে, দেখছেন না আমার নিজেরই মাথায় বড়ো টাক? যদি সত্যিই আমি চুল গজাতে পারতাম, আমি নিজের চিকিৎসা করতাম না? আরে মশাই, আমি যে কিছুই করতে পারব না, সেটা বোঝাতেই আমি আপনাকে আমার মাথার পরচুলা খুলে দেখালাম, তবু আপনার মাথায় বিষয়টা ঢুকল না? বুদ্ধির বলিহারি আপনার!

এই বলেই সেই ঠগ ডাক্তার তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

টেকোর টাকে আর চুল গজাল না।

(সংগৃহীত)

বীর বনবাসী

বীর নারায়ণ সিংহ

স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর নারায়ণ সিংহের জন্ম ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে অধুনা ছত্তিশগড়ের সোনাখান গ্রামে। তিনি বিঞ্ঝবার জনজাতির মানুষ ছিলেন। তাঁর পিতার জমিদারিতে ৩০০টি গ্রাম ছিল। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর ওপরে সেই দায়িত্ব বর্তায়। তিনি প্রজাবৎসল শাসক ছিলেন। ১৮৬৫ সালে প্রচণ্ড খরায় খাদ্যাভাব দেখা দিলে তিনি স্থানীয় ব্রিটিশভক্ত সাহুকারদের থেকে জোর করে খাদ্যসামগ্রী নিয়ে গরিব মানুষদের বিলি করেন। এজন্য ইংরেজ তাঁর জমিদারি আক্রমণ করলে তাঁর নেতৃত্বে হাজার হাজার জনজাতি যোদ্ধা ইংরেজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ১৮৫৫ সালে তিনি বন্দি হন এবং ১৮৫৭ সালে তাঁকে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হয়। তাঁর সম্মানে রায়পুরে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্টেডিয়ামের নাম 'শহিদ বীর নারায়ণ সিংহ স্টেডিয়াম' করা হয়েছে।

জানো কি?

- কলকাতার আয়তন ২০৬.১ বর্গকিলোমিটার।
- গোবিন্দপুর, সুতানুটি ও কলকাতা—এই তিনটি গ্রাম নিয়ে গড়ে ওঠে কলকাতা মহানগর।
- পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ড. প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ।
- পশ্চিমবঙ্গের প্রথম রাজ্যপাল চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী।
- ভারতের দীর্ঘতম বারান্দা রামেশ্বর মন্দিরের বারান্দা।
- ভারতের ব্যস্ততম শহর মুম্বাই।

ভালো কথা

বৃষ্টিভেজা

সেদিন যখন বিকেলে অন্ধকার করে আকাশ মেঘে ঢেকে এল,তারপর বৃষ্টি শুরু হতেই আমরা উঠোনে নেমে ভিজতে শুরু করলাম। ক'দিনের গরমে শরীর জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল। ভাইয়ের সারা গায়ে ঘামাচিতে ভরে গিয়েছিল। মা ভাইকে এনে বৃষ্টির মধ্যে ছেড়ে দিল। ভাইয়ের কী আনন্দ। একটু পরে দাদু ও ঠাকুমাও নেমে এসে ভিজতে লাগল। আধঘণ্টার বৃষ্টিতে ভিজে শরীর ঠাণ্ডা হলো। সন্ধ্যায় দেখি, আমাদের গায়ের ঘামাচি আর নেই। বাবা বলল, প্রথম বৃষ্টিতে ভেজা শরীরের পক্ষে খুব উপকারী।

তুষার হাজরা, ষষ্ঠ শ্রেণী, পূর্বস্থলী,বর্ধমান।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

কারবাইডে পাকা

প্রতিমা সাহা, ষষ্ঠ শ্রেণী, পুরাতন মালদা, মালদা।

আম পেকেছে জাম পেকেছে
কাঁঠাল পেকেছে,
মালদাতে এবার দেদার আম
দামও কমেছে।

খাচ্ছি আমরা নানান জাতের
টুকটুকে গাছ পাকা
কলকাতাতে খাচ্ছে সবাই
কারবাইডে পাকা।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

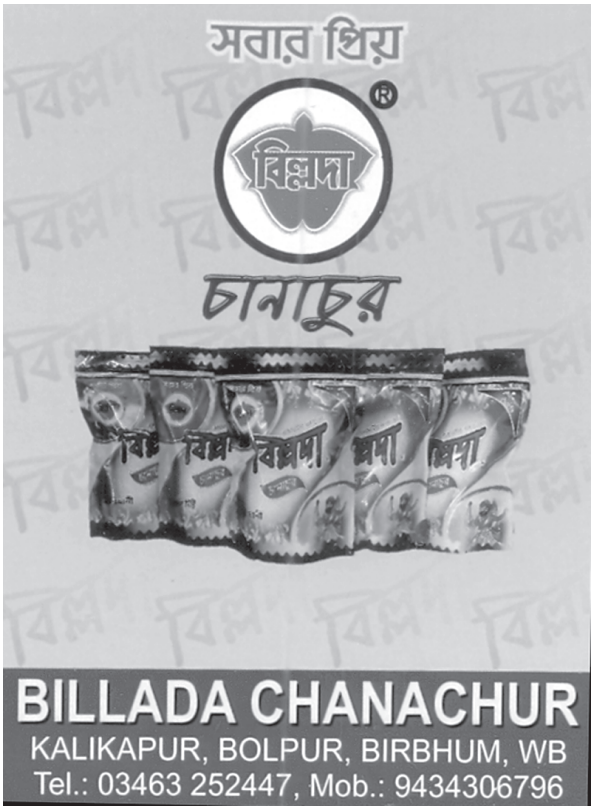

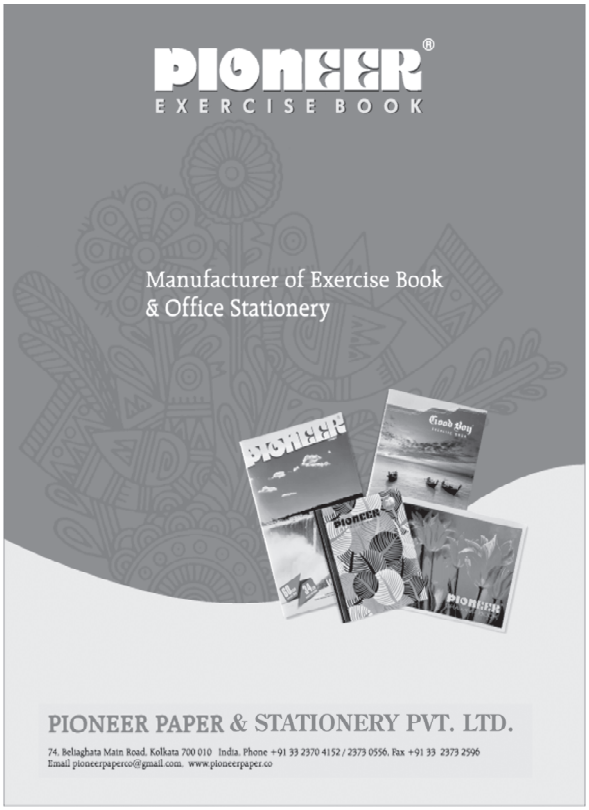

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

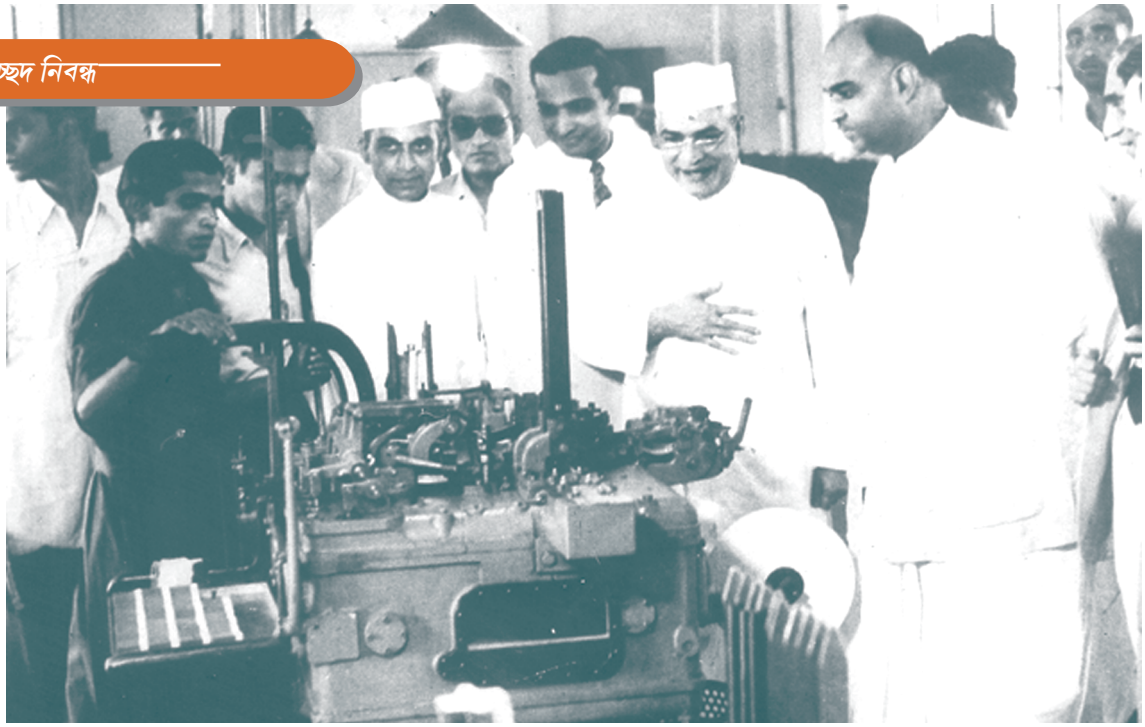

শিল্পমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদের ফ্যাক্টরি পরিদর্শন।

স্বাধীন ভারতের প্রথম শিল্পমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশের স্বাধীনতা লাভের সময় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ই ছিলেন প্রধান বাঙ্গালি নেতা। জিন্নার গ্রাস থেকে বাঙ্গলার পশ্চিমের বেশ কিছু অংশ ছিনিয়ে বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গ গঠন এবং সে সময়ের ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নগরী জিন্নার সাধের কলকাতাকে ভারতবর্ষেরই অন্তর্ভুক্ত রাখা, তাঁর বুদ্ধিতে সম্ভব হয়েছিল। ফলে হিন্দু মহাসভার নেতা হলেও তৎকালীন কংগ্রেসি নেতারা শ্যামাপ্রসাদের নাম প্রথম মন্ত্রীসভায় চূড়ান্ত করেন। এই ব্যাপারে গান্ধীজীও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তবু শ্যামাপ্রসাদের মনে কিছু দ্বন্দ্ব ছিল মন্ত্রীসভায় যোগদান করা নিয়ে। কিন্তু সাভারকরও তাঁকে মন্ত্রীসভায় যোগদান করারই পরামর্শ দেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও সরবরাহ দপ্তর তাঁকে দেওয়া হয়। অবশ্য তাঁর পক্ষে উপযোগী হতো শিক্ষাদপ্তর। কারণ কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ নিজের জীবনের অধিকাংশ সময়েই শিক্ষার সেবায় কাটিয়েছেন। তিনি দেশের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী হলে একটি জাতীয় শিক্ষানীতির ভিত্তি স্থাপন করতে পারতেন এবং দেশের তরুণ সমাজ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মিথ্যা ইতিহাস পড়তে বাধ্য হতো না। বলরাজ মাধোক তাঁর 'Portrait of a Martyr' গ্রন্থে দুঃখ করে বলছেন মৌলানা আজাদ তাঁর ব্যক্তিগত অ্যাজেন্ডা রূপায়ণ করার জন্য এই দপ্তর নিজের হাতে রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তা সত্ত্বেও শিল্প দপ্তরের মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর তাঁকে প্রদান করা কংগ্রেসি নেতৃত্বের তাঁর প্রতি আস্থাই প্রমাণ করে। আগে অখণ্ড বাঙ্গলার শ্যামা-হক মন্ত্রীসভায় অর্থমন্ত্রী হিসেবেও প্রায় এক বছর তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছিলেন— এটাই হয়তো তাঁকে শিল্পমন্ত্রক দেওয়ার পিছনে অন্যতম কারণ হতে পারে। এই দপ্তরে দায়িত্ব পাওয়ার ফলে ভারতের শিল্পনীতির ভিত্তিস্থাপন এবং ভবিষ্যৎ ভারতের শিল্প বিকাশের রূপরেখা তৈরি করার সুযোগ পেলেন শ্যামাপ্রসাদ। মাধোক বলেছেন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যা ক্ষতি হলো অর্থনীতি ও শিল্পবিকাশের ক্ষেত্রে তা পূরণ হয়ে গেল।

১৯৪৮-এর ৬ এপ্রিল ভারত সরকার যে শিল্পনীতি প্রকাশ করে তাতে শ্যামাপ্রসাদের শিল্পসংক্রান্ত চিন্তাধারা প্রকাশিত হয়। এই নীতির মূল কথা ছিল মিশ্র অর্থনীতি যেখানে সরকারের একটা সর্বব্যাপী ভূমিকা থাকবে শিল্পের পরিকল্পিত বিকাশ ও উন্নতির জন্য। এতে বলা হলো সরকার প্রয়োজনে কোনো শিল্প অধিগ্রহণ করতে পারবে বটে, কিন্তু বেসরকারি শিল্পোদ্যোগেরও একটি বিশেষ জায়গা ও ভূমিকা থাকবে। শিল্পক্ষেত্রে সরকার কোন কোন ক্ষেত্রে যাবে তা নির্দিষ্ট করার জন্য সমস্ত শিল্পোদ্যোগকেই তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হলো। প্রথম শ্রেণীতে থাকবে সেই সব শিল্প যার পরিচালনা ও মালিকানা দুই'ই থাকবে সরকারের হাতে। এর মধ্যে থাকবে অস্ত্রশস্ত্র, পারমাণবিক শক্তি, নদী উপত্যকা পরিকল্পনা ও রেল। দ্বিতীয় শ্রেণীতে সরকারের একটি ক্রমবর্ধমান ভূমিকা থাকবে, কিন্তু বেসরকারি শিল্পকে সরকারি শিল্পের পরিপূরক হতে হবে। এর মধ্যে থাকবে কয়লা, ইস্পাত, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বেতার, জাহাজ নির্মাণ এবং খনিজ তেল। তৃতীয় শ্রেণীতে থাকবে বাকি যাবতীয় শিল্প যা পুরোপুরি বেসরকারি ক্ষেত্রের জন্য, কিন্তু সেখানেও সরকারের একটা নীতি প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা থাকবে। এই শ্রেণীতে থাকবে সার, সুতি ও পশম বস্ত্র, কাগজ ইত্যাদি শিল্প। কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা ক্ষুদ্র শিল্পের সমন্বয়ের কথাও এই নীতিতে বলা হয়েছিল।

এই নীতি অনুযায়ী শ্যামাপ্রসাদ চারটি অগ্রগণ্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা করেন। এগুলি হলো চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস (চিত্তরঞ্জন, পশ্চিমবঙ্গ), হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফটস্ (ব্যাঙ্গালোর), সিন্ধ্রি ফার্টিলাইজার (সিন্ধ্রি, বিহার, বর্তমান ঝাড়খণ্ড) এবং দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন। কারখানাগুলি সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন এখানে। চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস ভারতবর্ষে প্রথম রেলইঞ্জিন তৈরির কারখানা (তখন ইঞ্জিন মানে কয়লা বা বাষ্পের ইঞ্জিন)। এর আগে ইঞ্জিন এবং তার

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

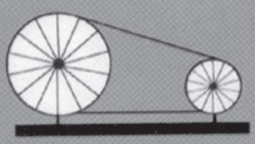

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম

চির পরিচিত
দুলালের®
তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান — দারুণ কাজ দেবে।

ভারত সরকারের R চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন

দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

সব যন্ত্রাংশ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হতো। পনেরো কোটি টাকা ব্যয়ে এই কারখানাটি তৈরি হয় এবং ১৯৫০-এ কারখানা থেকে প্রথম ইঞ্জিন বেরোয়।

তদানীন্তন বিহারের ধানবাদের অদূরে একটি গ্রাম ছিল সিন্ধ্রি। সারের সমস্যা মেটানোর জন্য এখানে একটি কারখানার পরিকল্পনা করা হয় যেখানে বছরে সাড়ে তিন লক্ষ টন অ্যামোনিয়াম সালফেট তৈরি হবে এবং এর বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে যে ক্যালসিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন হবে তাকে কাজে লাগানোর জন্য একটি সিমেন্ট কারখানারও পরিকল্পনা করা হয়, যা বছরে ১ লক্ষ টনের ওপর সিমেন্ট উৎপাদন করবে। এর জন্য একটি বিদ্যুৎ কারখানারও পরিকল্পনা করা হয় যা শুধু এই কারখানা দুটিকেই নয় গোটা বিহারকেই বিদ্যুৎ জোগাবে। এই কারখানা সরকারের প্রথম শিল্পোদ্যোগের একটি হওয়ার কারণে শ্যামাপ্রসাদকে নানারকম আমলাতান্ত্রিক বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। দক্ষ হাতে শ্যামাপ্রসাদ সেসবের সমাধান করে কারখানার গোড়াপত্তন করেছিলেন।

দামোদর নদের বন্যার কারণে তদানীন্তন বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে খুবই সমস্যার মধ্যে পড়তে হতো। ১৯৪৮-এ ঠিক করা হয় যে একটি কর্পোরেশন গঠিত হবে যার মালিকানা থাকবে ভারত, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সরকারের হাতে। এর উদ্দেশ্য ছিল বহুবিধ— বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ, জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন, অভ্যন্তরীণ জলপথ, বনসৃজন, ভূমিক্ষয় রোধ, জমির যথাযথ ব্যবহার, উৎখাত হওয়া মানুষের পুনর্বাসন, জনস্বাস্থ্য এবং সাধারণভাবে দামোদর নদের উপত্যকায় মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি। এই পরিকল্পনায় ছিল ৮টি জলাধারবিশিষ্ট বাঁধ (ড্যাম), কিন্তু শেষপর্যন্ত তৈরি হয় ৪টি— দামোদরের উপনদীগুলির ওপর তিলাইয়া, মাইথন ও কোনার এবং দামোদরের ওপর পাঞ্চেত। পুরো পরিকল্পনা শেষ হবার অনেক আগেই অবশ্য শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেছিলেন।

ওড়িশার সম্বলপুরের কাছে মহানদীর ওপর হীরাকুঁদ বাঁধ প্রকল্পও শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। সেচের জল ছাড়াও পশ্চিম ওড়িশার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিদ্যুৎ জোগায় এই প্রকল্প। শ্যামাপ্রসাদের মন্ত্রিত্বকালেই মধ্যপ্রদেশে একটি কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট তৈরির কল সরকারি মালিকানায় চালু হয় এবং কারখানার নামানুসারে জায়গাটির নাম হয় নেপানগর।

পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে সহযোগিতা তাঁর মন জুড়ে ছিল, সেখানে মার্কসবাদী চিন্তার শ্রেণীসংগ্রাম কখনো স্থান পায়নি। এই শ্রেণীসংগ্রাম করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছরে বামপন্থীরা প্রায় ৫৬,০০০ কলকারখানা বন্ধ করিয়েছে— যার ফল আজকের এই লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকের সৃষ্টি। শ্রমিক সম্প্রদায় যেমন তাঁর কাছ থেকে সহানুভূতির আশ্বাস পেয়েছিল, তেমনি শিল্প মালিকরাও জানতেন যে তিনি তাঁদের সমস্যা বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই বিচার করবেন। ১৯৪৮-এর ফ্যাক্টরিজ আইনে বলা হয় কোনো কারখানায় শ্রমিক নিয়োগ করতে হলে তার নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও কল্যাণের দায়িত্ব কারখানার মালিককে নিতে হবে। এই আইন লঙ্ঘন করলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। বিশাখাপত্তনমের জাহাজ কারখানায় শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করার প্রায় দু'বছর পর একটি শ্রমিক- ম্যানেজমেন্ট বিরোধ বাঁধে। তখন শ্রমিকরা জানায় যে শ্যামাপ্রসাদ যদি এ ব্যাপারে মধ্যস্থতা করেন তাহলে তিনি যা সিদ্ধান্ত নেবেন— তা শ্রমিকরা মেনে নেবে। এ থেকেই শ্যামাপ্রসাদের প্রতি শ্রমিকদের আস্থার প্রমাণ মেলে।

দেশের প্রথম শিল্পমন্ত্রী হিসাবে শ্যামাপ্রসাদ দেশলাই শিল্প, সূতি বস্ত্রশিল্প প্রভৃতির কিছু সমস্যারও সমাধান করেন। এক সুইডিশ শিল্পপতির শিল্পসংস্থা উইমকোর দেশলাই কারখানা ছিল অমরনাথ, মাদ্রাজ, বেরিলি, কলকাতা ও ধুবড়িতে। বর্তমান তামিলনাড়ুর শিবকাশী এলাকায় দেশলাইয়ের বেশ কিছু কুটিরশিল্প ছিল। তারা অভিযোগ জানায় যে উইমকোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তারা পেরে উঠছে না। এই সমস্যার নিরসনকল্পে শ্যামাপ্রসাদ প্রথমত হাতে তৈরি দেশলাইয়ের ওপর কর (এক্সাইজ ডিউটি) কমিয়ে দিলেন, প্রয়োজনীয় কাঁচামাল অর্থাৎ পটাশিয়াম ক্লোরেট, গন্ধক ও ফসফরাস আমদানির ব্যবস্থা করলেন এবং এই কুটির-শিল্পজাত দেশলাইয়ের দেশ জুড়ে সুবিধাজনক শুল্কে বিতরণের সুবিধা করে দিলেন। বেশি পরিমাণে কাঁচামাল কেনার জন্য স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থাও করে দিলেন। এইসব কুটির শিল্প মাঝেমধ্যে পারিবারিক অশান্তির কারণে বন্ধ হয়ে যেত। শ্যামাপ্রসাদ তদানীন্তন মাদ্রাজ সরকারকে দিয়ে এদের সমবায় ব্যবস্থার মধ্যে আনলেন এবং কাঁচামাল কেনা ও তৈরি জিনিস বিক্রির সুবিধাজনক শর্তে সরকারি ঋণেরও ব্যবস্থা করলেন। এর ফলে এই শিল্পের ৯০ শতাংশ সমস্যা অন্তর্হিত হয়ে গেল।

মন্ত্রিত্বে থাকাকালীন পশম, কলে তৈরি সূতি বস্ত্র ও তাঁত বস্ত্রের প্রতি শ্যামাপ্রসাদ বিশেষ নজর দেন। হস্তচালিত তাঁতে বোনা পশমবস্ত্রের জন্য শ্যামাপ্রসাদ সমবায় গঠন করে একই ছাতার তলায় আনার চেষ্টা করেন। সরকারের তরফ থেকে প্রচেষ্টা হলো এদের প্রযুক্তি ও বাজারজাত করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত করানো। হস্তশিল্পের জন্য কেন্দ্রীয় পশম প্রযুক্তি কেন্দ্র ও কেন্দ্রীয় বিপণি খোলা হলো।

সূতি তাঁতশিল্পের অবস্থাও তখন একটু সংকটে ছিল। সে সময় এতে প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষ কর্মরত ছিলেন। রপ্তানি বাণিজ্যের সুযোগ তৈরির জন্য শ্যামাপ্রসাদ ভারতীয় তাঁত বস্ত্রের কিছু নমুনা বিদেশে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের বাণিজ্যিক আধিকারিকদের নিকট পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলিকে রাজি করালেন খাদি এবং হস্তচালিত তাঁতের কাপড়ের ব্যবহারের জন্য। রেলকে রাজি করালেন এর মাশুল কমাবার জন্য। উত্তরপ্রদেশের হরদুয়ারগঞ্জে একটি কেন্দ্রীয় কুটির শিল্প শিক্ষালয়ও তৈরি করলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল তাঁতিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যাতে তারা তাদের কাজে উন্নততর প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে পারেন এবং সেই সঙ্গে নতুন নতুন নকশা সৃষ্টি করতে পারেন।

মাত্র আড়াই বছরের মন্ত্রিত্বকালে শ্যামাপ্রসাদ কিছু সমস্যারও সম্মুখীন হন। তথাগত রায় তাঁর 'ভারতকেশরী যুগপুরুষ শ্যামাপ্রসাদ' গ্রন্থে জানাচ্ছেন যে ১৯৪৮-এর ১ ডিসেম্বর নেহরু শ্যামাপ্রসাদকে একটি গোপন চিঠিতে লিখলেন, সর্বত্র নাকি গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে যে শ্যামাপ্রসাদ নিজের দপ্তরটিকে একটি ছোটোখাটো বাংলা বানিয়ে ফেলেছেন। ১৯৫০-এর ১৩ ফেব্রুয়ারি আবার নেহরু শ্যামাপ্রসাদকে একটি চিঠি লিখে জানান যে শ্যামাপ্রসাদের দপ্তরে নাকি গেজেটেড পদে অতিরিক্ত বাঙ্গালি নিয়োগ হয়েছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, এর মাত্র কিছুদিন আগেই ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকা-সহ পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় বাঙ্গালি হিন্দুদের কচুকাটা করা শুরু হয়েছে। নেহরু সেসব না ভেবে তখনও শ্যামাপ্রসাদের পিছনে লাগতে, তাঁকে নানাভাবে উত্যক্ত করতে ব্যস্ত। পূর্ব পাকিস্তানে ভয়ংকর হিন্দু নির্যাতনের কোনো প্রতিকারের ব্যবস্থা না করে নেহরু বাঙ্গালি হিন্দুদের পক্ষে আত্মঘাতী এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন ১৯৫০-এর ৮ এপ্রিল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের সঙ্গে (যা নেহরু-লিয়াকত চুক্তি নামে খ্যাত)। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নেহরুর বাঙ্গালি হিন্দু উদ্বাস্তুর স্বার্থ রক্ষার্থে অনীহা বুঝে পদত্যাগ করেন। ফলে আরও অন্যান্য ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতির অনেক সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।

(লেখক ইতিহাসের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক)

With Best Compliments from-

THE JOREHAUT GROUP LIMITED

Gardens :

Borsapori, Numalighur, Langharjan & Rungagora 'J'

THE JOREHAUT AGRO LIMITED

Bhadra Tea Factory

AGRI IMPORT & EXPORT LIMITED

Office : 26, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 017, India

Phone : 2287-9388, 2290-4427, Fax : (033) 2281-0199

E-mail : jorehaut@jorehaut.com, Website : www.jorehaut.com

Producers & Exporters of Quality Teas Worldwide

With Best Compliments from :-

A

Well Wisher

With Best Compliments from-

B.J.P. Ex-vice President

PIYUSH KANODIA

Kolkata North
Subarban District

বামফ্রন্ট আমলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটে

অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়

গ্রামীণ ভারতের স্বায়ত্ত শাসনের মূলস্তম্ভ পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। গরিব, পিছিয়ে পড়া, প্রান্তিক জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের পরিকাঠামো হলো পঞ্চায়েতি রাজ। বৈদিক যুগে এই ব্যবস্থার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। চতুর্বেদের অভ্যন্তরে উল্লেখ পাওয়া যায়, সভা ও 'সমিতির'। ঋক্‌বেদে ৮ বার এবং অথর্ব বেদে ১৭ বার সভা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অথর্ব বেদে বৈদিক দেবতা প্রজাপতির দুই কন্যা সভা ও সমিতি রূপে বর্ণিত হয়েছে। সমাজের সব স্তরের জনসাধারণের যোগদানে গঠিত হতো সমিতি। আর প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ, পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে গঠিত হতো সভা। সমাজের নারীদের স্থান ছিল এই সভায়। সভায় অংশগ্রহণকারী নারীরা সভাবতী নামে পরিচিত ছিলেন। সভার মাধ্যমে সাধন প্রণালী, হোম-যজ্ঞ, বৈদিক দর্শন, সংগীত, নৃত্যকলা, জ্যোতিষ, সামাজিক ন্যায়বিচার ইত্যাদির আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হতো। সমিতি ছিল আপামর জনসাধারণের সম্মেলন স্থল, সেখানে জনসমাজের সব রকম বিষয় – কৃষিকাজ, পূজার্চনা, সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান, পালাপার্বণ, দেবতাদের উদ্দ্যেশে প্রার্থনা ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হতো। জনগণের মিলন ক্ষেত্র এই সমিতির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হতেন গোষ্ঠী বা সমাজের অধিপতি রাজন।

কপিলাবস্তুর নৃপতি ভগবান বুদ্ধের পিতৃদেব শুদ্ধোদন ছিলেন গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রাজা। প্রাচীন ভারতে ষোড়শ মহাজনপদের যুগে গণ ও সঙ্ঘের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা ছিল প্রজাতন্ত্রের পরিচায়ক। এইসব গণরাজ্যের সামাজিক, প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল জনগণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। লিচ্ছবিবংশের প্রভাবাধীন বৃজি নামক জনপদে এই শক্তিশালী প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়। সমসাময়িক কালে, চাণক্য রচিত অর্থশাস্ত্রে সমাজ ও প্রশাসনিক প্রধানের দ্বারা শাসিত সেই জনপদের স্বাধীন, সার্বভৌম সত্তার স্বীকৃতি রূপে সংশ্লিষ্ট রাজনের 'চক্রবর্তী' উপাধির প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ রয়েছে। রাজা যদি চক্রবর্তী না হন, তবে সেই রাজ্য অন্য সাম্রাজ্যের অধীন বলে বিবেচিত হবেন। 'রাজচক্রবর্তী'হলেন তাঁর রাজ্যের সার্বভৌমত্বের প্রতীক।

সঙ্গম যুগে এবং তার পরবর্তীকালে ৮৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দে ত্রিচি হতে দক্ষিণ অন্ধ্র পর্যন্ত বিস্তৃত চোল সাম্রাজ্যের মূল প্রশাসনিক ভিত্তি ছিল পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। চোল রাজ্যে সভা কতকগুলি পঞ্চায়েতে বিভক্ত ছিল। 'সভার' সদস্যদের বলা হতো পেরুমাক্কাল। পঞ্চায়েত সদস্যদের বলা হতো ভারিয়া পেরুমাক্কাল। গ্রাম স্তরে এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ক্ষুদ্রতম একক ছিল গ্রাম সভা। সেই যুগে চোল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এই গ্রামসভার মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালিত হওয়ার সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের প্রায় সর্বত্র ল্যান্ড সার্ভে বা জমি জরিপের কাজ সম্পন্ন হয়। ভূমি রাজস্ব ছিল প্রশাসন পরিচালনার অন্যতম উৎস। চোল রাজত্বে এই সশক্ত পঞ্চায়েত পরিকাঠামোর আনুকূল্যে কৃষ্ণা-গোদাবরী অববাহিকায় সেচব্যবস্থার প্রভূত উন্নতির দরুন খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল উল্লেখযোগ্য।

মধ্যযুগের শেষের দিকে মধ্য ভারত, পশ্চিম ভারত ও দাক্ষিণাত্য জুড়ে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ জায়গিরদারি ও জমিনদারি ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে রাজকর্মচারীদের বেতন দেওয়ার প্রথা প্রবর্তন করেন। রাজকর্মচারীদের পদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিকতা বিলুপ্ত করেন। সামরিক কর্মচারীদের থেকে প্রশাসনিক ও দেওয়ানি বিভাগের আধিকারিকদের স্থান তাঁর রাজত্বে উচ্চতর পদ রূপে বিবেচিত হতো। অষ্টপ্রধান রূপে পরিচিত ছিল তাঁর মন্ত্রীসভা। প্রত্যেক মন্ত্রীর প্রশাসনিক কাজের জন্য ৮ জন করে সহায়ক নিযুক্ত হতেন। প্রশাসনিক কাজের ক্ষেত্রে তাঁর রাজত্বে ১৮টি মন্ত্রকের উল্লেখ পাওয়া যায়। শিবাজী মহারাজ স্বরাজ বা সাম্রাজ্যকে চারটি প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রতিটি প্রদেশ একাধিক জেলায় এবং জেলাগুলি অসংখ্য গ্রামে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদের নাম ছিল দেশপাণ্ডে অথবা পাটিল। পঞ্চায়েত প্রধানরা অন্যান্য পঞ্চায়েত সদস্যদের সহযোগিতায় গ্রামীণ প্রশাসন পরিচালনা করতেন।

ব্রিটিশ আমলে বঙ্গভূমিতে গ্রামীণ প্রশাসন পরিচালনায় গড়ে ওঠে ইউনিয়ন বোর্ড। দ্য বেঙ্গল ভিলেজ সেল্ফ গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯১৯ আইনের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা বলবৎ করা হয়। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে এই আইনের বিরুদ্ধে মেদিনীপুর জেলায় গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। কাঁথিতে এই আন্দোলনের অভূতপূর্ব সাড়া মেলে। তাঁরা এই ইউনিয়ন বোর্ড বয়কটের ডাক দেন। স্বাধীন ভারতে, পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫০ সালে দ্য ওয়েস্ট দিনাজপুর ইউনিয়ন বোর্ডস অ্যাক্ট পাশ হয়। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ১৯৭৩ সালে বিধানসভায় পাশ হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত অ্যাক্ট। একেকটি গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হয় একাধিক গ্রাম নিয়ে। সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলিতে গ্রামসভা বা গ্রামসংসদ এবং গ্রামের মানুষের, কৃষকদের যাবতীয় সমস্যা সমূহের সমাধানের লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত পর্যালোচনা ইত্যাদির জন্যে নিয়মিত গ্রামসংসদের বৈঠকের সংস্থানও রাখা হয় এই আইনে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, প্রখ্যাত আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ অশোক সেন, শঙ্করদাস ব্যানার্জী, কাশীকান্ত মৈত্র চিরকালই গ্রামবাঙ্গলায় দলীয় রাজনীতিমুক্ত, স্বচ্ছ, ত্রিস্তর বিশিষ্ট (গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ) স্থানীয় সরকার বা লোকাল গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা তৈরির পক্ষপাতী ছিলেন। প্রথম দিকে এই আইনটি সেভাবেই তৈরি হলেও (১৯৯২ সালের) ৭৩ ও ৭৪তম সংবিধান সংশোধনীর সুযোগ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন বামফ্রন্ট সরকার ১৯৯৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনে সংশোধনী আনে। এর মাধ্যমে পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, জেলা পরিষদের সভাধিপতি এবং বাকি সদস্যদের সামগ্রিক নির্বাচনে অনুপ্রবেশ ঘটে দলীয় রাজনীতির। পরিণামে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থা হয়ে ওঠে শাসকের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার এবং শাসকদলের নেতা-কর্মীদের আখের গোছানোর ও ব্যাপক লুঠের আখড়া। সড়ক যোজনা, আবাস যোজনা, পরবর্তীকালে গ্রামীণ রোজগার যোজনায় ব্যাপক দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও গ্রামবাঙ্গলা জুড়ে সার্বিক অনুন্নয়নের চিত্র যার ফলশ্রুতি। □

রাজনৈতিক দলকেন্দ্রিক পঞ্চায়েতরাজ শুধু পশ্চিমবঙ্গেই

নারায়ণশঙ্কর দাশ

অপ্রিয় হলেও একথা সত্যি, ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৭, স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রথম তিন দশক পশ্চিমবঙ্গবাসীর মন ও মস্তিষ্কে তৃতীয় শ্রেণীর রাজনীতির আবহ ছিল না। শহরে অল্প স্বল্প থাকলেও সহজ-সরল গ্রামীণ জীবনে একদমই ছিল না বললেই চলে। ১৯৭৭ সালের আগে আমি বাবার সঙ্গে গ্রামে যেতাম জমিজমা ছিল বলে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বলছি, সেসময় গ্রামের সব মানুষই ছিল অতি আন্তরিক। জটিলতা, কুটিলতা, হিংসা, স্বার্থপরতা, হিংস্রতা, এসব কী জিনিস, সেটা তারা জানত না বললেই চলে। কারণ রাজনীতির বিষবাষ্প তখনও গ্রামে প্রবেশ করেনি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৭ সালে ১০টি পার্টির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে বামফ্রন্ট সরকার। তারা শুধু স্কুলেই ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচনের মাধ্যমে গঠন করে প্রধান শিক্ষকের ক্ষমতা সংকুচিত করেই ক্ষান্ত থাকেনি, তারা ১৯৭৮ সালে গ্রামবাঙ্গলার সহজ-সরল মানুষদের মনে ঢুকিয়ে দেয় পঙ্কিল রাজনীতি— পঞ্চায়েতরাজ। ফলস্বরূপ গ্রামীণ জীবনে রাজনৈতিক হানাহানির অনুপ্রবেশ ঘটে। সেই সঙ্গে শিক্ষকদের প্রশাসনিক ক্ষমতা রাজনীতির ঘেরাটোপে থাকার দরুন বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের মান যেমন আগের তুলনায় তলানিতে এসে ঠেকল। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার রাজনীতিকরণ করার ফলে গ্রামের সরল সাধারণ মানুষেরা রাজনৈতিক জ্ঞানের অভাবে পঞ্চায়েত ভোটকে জীবন জীবিকার এক লোভনীয় দিক বলে বেছে নিয়ে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ল।

যোগ চিকিৎসা ডিপ্লোমা কোর্স

ডিপ্লোমা কোর্স অ্যাডভান্স থেরাপিউটিক হঠ এন্ড রাজযোগ
(D.A.T.H.R.Y.)

পাঠ্যসূচী ঃ- ইনট্রোডাকশন টু ইন্ডিয়ান ফিলোসফি, অষ্টাঙ্গযোগ, অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি, ফুট এন্ড নিউট্রিশন, সাম কমন ডিজিজেস্, ইন্ডিয়ান ডায়াটেটিক্স, ভেষজ (হার্বাল) প্রয়োগ, ন্যাচারোপ্যাথি, রাজযোগ ও কুণ্ডলিনীযোগ, হরস্কোপ থেরাপি, মেডিটেশন প্রাকটিস, স্ট্রেস (Stress) ম্যানেজমেন্ট, যোগ প্রাক্টিক্যাল (আসন-প্রাণায়াম-মুদ্রা), থেরাপিউটিক ম্যাসাজ (যোগিক ও ফিজিওথেরাপি), স্ট্রেচিং, যৌগিক চিকিৎসা (ট্রিটমেন্ট), প্রাক্টিস টিচিং।

সময়কাল : ১ বছর। ৩০ জুলাই থেকে আরম্ভ।
যোগ্যতা : ১৮ বছর বয়স ও সর্বনিম্ন মাধ্যমিক পাশ।
ক্লাস : প্রতি রবিবার ১টা থেকে ৪টা।

1977
স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ
Regd. NGO, NITI AAYOG, New Delhi -, Govt,. of India

কোর্স ফি : ১০,০০০ টাকা। এককালীন ৮০০০ টাকা।
ইনস্টলমেন্টে প্রথমে ৫০০০ টাকা, পরের মাসে ২৫০০ টাকা করে।

ফর্ম ও প্রসপেক্টাস : ১০০ টাকা
১০১, সার্দান অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ২৯
9051721420 / 9830597884/9836522503

১৯৮১ সালের পে কমিশনের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক-সহ আর সবার বেতন হয়তো বাড়লো; বাড়লো শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, সারা ভারতে। কিন্তু এক অনুমানকে ভিত্তি করে সমস্ত সরকারি স্কুলে রাজনীতিকরণ হেতু তাদের সম্মান, সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্যতা ও ত্যাগ যা এতদিন তিল তিল করে গড়ে উঠেছিল, সেটা ক্রমশ তলানিতে আসতে লাগলো। সর্বশিক্ষা প্রদানের নামে ছাত্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অকল্পনীয় ভাবে নম্বরের শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকলো। এতদিন যা ছিল না, তখন থেকে বেনোজলের মতো স্টার-সুপার স্টারদের উদয় হতে থাকলো। যারা গ্রামের শিক্ষকতায় পেশা ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিযোগিতামূলক পেশায় যেতে ভীত সন্ত্রস্ত। এর পাশাপাশি সুকৌশলে গড়ে তোলা হলো পঞ্চায়েত রাজ। রাজনৈতিক দলকেন্দ্রিক ভোটের মাধ্যমে এই পঞ্চায়েতরাজ ভারতের অন্য কোথাও নেই।

শুধু তাই নয়, কমিউনিস্টরাই ১৯৯৩ সালে আইন প্রণয়ন করে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের প্রশাসনিক ক্ষমতা কেড়ে নেয়। রাজ্য সরকারের সংশোধিত আইন অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশন রাজ্য সরকারের সঙ্গে নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো আলোচনা ছাড়া কোনো সিদ্ধান্তই নিতে পারে না। ফলে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য নির্বাচন কমিশনার কার্যত ঠুঁটো জগন্নাথ। আগে সেটা ছিল না। এর ফরে গ্রামবাঙ্গলার অতি সরল, সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে আসে চূড়ান্ত দুর্ভোগ আর অশান্তি। এযাবৎকালের শান্ত এ রাজ্য অশান্তির কালো জালে নিজেদের অজান্তেই জড়িয়ে পড়ে। যার ফলশ্রুতিতে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর আজও আপাত নিরীহ গ্রামবাঙ্গলায় ঘটে চলেছে অজস্র রক্তপাত, হানাহানি আর মৃত্যু। গ্রামবাঙ্গলাকে অশান্ত করতে, সহজ সরল মানুষদের জটিল, কুটিল, আগ্রাসী করতে, রক্তপাত ও মৃত্যু ঘটাতে রাজনীতিনির্ভর ভোটকেন্দ্রিক পঞ্চায়েতরাজের জুড়ি মেলা ভার। পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতে এর জন্মদাতা কিন্তু এ রাজ্যের কমিউনিস্টরাই। ফলে বর্তমান রাজ্য সরকারের নির্বাচনী কমিশনার রাজীব সিনহাকে অনুপ্রাণিত ও গৃহপালিত বলে দেগে দেওয়াটা অর্বাচীনতারই নামান্তর। বামেদের শোভা পায় না। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শাসক যা করছে, তা বামেদের নীতিরই প্রতিফলন মাত্র।

এই চিহ্নে
ভোট দিন

পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন

নান্টু পাল
সহ-সভাপতি, শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা

Maithan Alloys Ltd.

ISO 9001:2008 COMPANY

Registered Office
Ideal Centre, 4th Floor
9, A.J.C. Bose Road, Kolkata - 700 017
T (033) 4063 2393, F (033) 2290 0383
E office@maithanalloys.com
W www.maithanalloys.com
CIN : L27101WB1985PLC039503

Works:
Unit-1 : P.O. Kalyaneshwari-713 369
Dist. - Burdwan (West Bengal)
Unit-2 : E.P.I.P. Byrnihat,
Dist.- Ri-bhoi-793 101 (Meghalaya)
Unit-3 : Plot No. 42 & 43, APSEZ
P.O. Atchutapuram,
Dist.- Visakhapatnam- 531 011 (AP)

ORIENT MOVIETONE CORPORATION LIMITED

CIN : L92142WB1946PLC013138

A World-class (B+G+7 Storied) office building, in the heart of the central business district, on 27, Bentinck Street, Kolkata- 700 001

By

M K GROUP

Contact no. 033-32901999
www.mkpoint.in

REGD. OFFICE :
9A, Esplanade East, Kolkata - 700 069
Phone : 2210-8763, 2248-3613
Fax : 033-2243-0751
E-mail : info@mkgroupindia.biz